অনীক

জুলাই ২০১২
বর্ষ ৪৯ ❑ সংখ্যা ১

সম্পাদকীয় ❑ ১

ঘটনাপ্রবাহ
সিঙ্গুরের ফাঁস ❑ প্রণব দে ❑ ২
রিও+২০ বসুন্ধরা সম্মেলন ❑ দীপঙ্কর দে ❑ ৪
সিপিআই(এম)-এর ঝুলি থেকে ❑ প্রবীণ রায় ❑ ৭

এপিডিআর-এর ৪০ বছর
ফিরে দেখা ❑ অমিতদ্যুতি কুমার ❑ ৯

পত্রপত্রিকা থেকে
রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের... ❑ অশোক মিত্র ❑ ১১

বিতর্ক
পুঁজিবাদের সঙ্কট ও মার্কসীয় মূল্য তত্ত্ব ❑
গুরুপ্রসাদ কর/অতনু ভট্টচার্য ❑ ১৩

শিক্ষা সংকট
শিক্ষার গঙ্গাযাত্রা ❑ শুভাশিস মুখোপাধ্যায় ❑ ১৮
প্রাথমিক শিক্ষার ইতিবৃত্ত ❑ সুনন্দ সান্যাল ❑ ২৪
সরকারি স্কুলই একমাত্র বিকল্প ❑ সংগ্রাম মুখার্জী ❑ ২৭
বেচো না বেচো না ❑ সলিল বিশ্বাস ❑ ৩১

প্রবন্ধ
কেমন আছে জঙ্গলমহল (২) ❑ বিশ্বজিৎ রায় ❑ ৩৫

যোগাযোগ, লেখা, চিঠিপত্র ও
টাকা-পয়সা পাঠাবার ঠিকানা :
প্রযত্নে/পিপলস বুক সোসাইটি
১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০০০৯
দূরভাষ : ৯৪৩২৮৭৭৫৬০
গ্রাহকদের যোগাযোগ : ৯৮৩০১৪৩৩৬৫/৯৪৩৩৭২৪৪৬২
বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা : ১৫০ টাকা
ই-মেল : aneek.bm@gmail.com
ব্লগ : aneekpotrika.wordpress.com

কার্যালয় :
১১, রাজা রামমোহন সরণী। কলকাতা ৭০০ ০০৯
(মঙ্গলবার : সন্ধ্যা সাতটা থেকে সাড়ে আটটা)

সম্পাদকমণ্ডলী : **দীপংকর চক্রবর্তী রতন খাসনবিশ সুমিতা সিদ্ধার্থ শুভাশিস প্রণব**

মানবাধিকার একটি বিলুপ্তপ্রায় 'প্রজাতি'!

পৃথিবী ও সমাজের বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় অসংখ্য প্রজাতির মতো সমাজবিজ্ঞানের বহু তত্ত্ব ও ধারণাও একের পর এক বিলুপ্ত হয়ে গেছে বা যাচ্ছে। 'মানবাধিকার'-এর আদর্শটিও সম্ভবত সেই পরিণতির দিকেই এগিয়ে চলেছে! কেন একথা বলছি? পুঁজিবাদের পূর্বসূরী ইউরোপীয় রেনেসাঁস ব্যক্তির যে পূর্ণ মুক্তির স্বপ্ন দেখিয়েছিল, 'মানবাধিকার'-এর ধারণাটি নিহিত ছিল সেই মুক্তির স্বপ্নের মধ্যেই। কিন্তু পুঁজিবাদ মানুষকে সেই মুক্তি দিতে পারেনি, বরং তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে আবদ্ধ করেছে শ্রেণীশোষণের আরো শক্ত নাগপাশে। অন্য দিকে কয়েক শতকের অভিজ্ঞতায় ধরা পড়েছে, সাম্রাজ্যবাদের পর্যায়ে পুঁজিবাদের উত্তরণের পর থেকেই সংকট তার নিত্য সঙ্গী। যত দিন যাচ্ছে, ততই এই সংকটের তীব্রতা বাড়ছে। পুঁজিবাদের বিকল্প হিসেবে সমাজতন্ত্রের প্রাথমিক অনুশীলন ব্যর্থ হয়ে যাবার পর পুঁজিবাদী তাত্ত্বিকদের বিজয়োল্লাসও ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে আসে। আর এই শতকের প্রথম থেকেই চলছে পুঁজিবাদের নিরবচ্ছিন্ন সংকটের এক নতুন প্রক্রিয়া— উন্নত দুনিয়ার পরম শক্তিধর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপ থেকে পৃথিবীর সমস্ত দেশেই সেই সংকট ব্যাপ্ত এবং তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠেছে। এই সংকট থেকে পরিত্রাণের মরিয়া প্রচেষ্টায় পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদীরা এখন নতুন করে ঝাঁপিয়ে পড়েছে সারা দুনিয়ার সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদ দখল করে শোষণের তীব্রতা বাড়াবার লক্ষ্যে। এজন্য সমস্ত দেশের সমস্ত আইন-কানুন ও রীতি-নীতিকে বিসর্জন দিয়ে অভূতপূর্ব ঔদ্ধত্যের সাথে সমস্ত দেশের রঙবেরঙের সমস্ত সরকারই আরো বেশি করে ব্যাপক মানুষের সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকারকে পদদলিত করছে, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসকে অভূতপূর্ব এক হিংস্রতার অনুশীলনে পরিণত করেছে। এই অবস্থা পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত এই পটভূমিকাতেই প্রায় অনিবার্য যে প্রতিটি দেশেই ক্রমশ আরো বেশি করে আক্রমণ নেমে আসছে মানবাধিকারের উপর, তাকে বিপন্ন ও বিলুপ্তপ্রায় করে তুলেছে।

আমাদের দেশেও অন্যান্য দেশের মতো এই প্রক্রিয়া ক্রমশ বলবৎ হচ্ছে। ১৯৪৮ সালে রাষ্ট্রসংঘের উদ্যোগে ভারত-সহ শতাধিক দেশের সম্মতিতে গৃহীত হয়েছিল আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদ। ঠিক সে সময়েই প্রণীত হচ্ছে উত্তর-উপনিবেশ ভারতের সংবিধান। ওই সনদে অন্তর্ভুক্ত স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশের, সংগঠিত হবার এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রতিবাদ জানাবার অধিকার; মানুষের খাদ্য-বস্ত্র-আশ্রয়-চিকিৎসা-ও শিক্ষার অধিকার এবং বিনা বিচারে আটক না থাকার অধিকার প্রভৃতি ভারতের সংবিধানেও কম-বেশি স্থান পেয়েছিল। সংবিধানের ১৩নং ধারায় স্পষ্ট ঘোষণা করা হয়েছিল যে, বৃটিশ আমলের মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী সমস্ত আইন বাতিল হবে, এবং নতুন করে এমন কোনো আইন প্রণীত হবে না। কিন্তু যত দিন গেছে, একের পর এক সেই ঘোষণাকে অর্থহীন করে তুলে বর্তমানে তাকে জঞ্জালের স্তূপেই প্রায় ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে। 'দেশের নিরাপত্তা'র অজুহাতে একের পর এক চালু হয়েছে ডিআইআর-পিডি-এএফএসপিএ-মিসা-এসমা-নাসা-টাডা-পোটা এবং অবশেষে পৃথিবীর

এর পর ৪০ পৃষ্ঠায়

সিঙ্গুরের ফাঁস

প্রণব দে

মমতা ব্যানার্জি ভালো মতো বেকায়দায় পড়েছেন। গত ২২ জুন ২০১২, বিচারপতি পিনাকিচন্দ্র ঘোষ এবং মৃণালকান্তি চৌধুরির ডিভিসন বেঞ্চের রায় তৃণমূল দলের সিঙ্গুর আন্দোলনকে এক বড়সড় ধাক্কা দিয়েছে। মমতা ব্যানার্জি মুখ্যমন্ত্রীর আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার ঠিক এক মাসের মাথায়, ২০ জুন ২০১১, তাঁর সরকার 'The Singur Land Rehabilitation and Development Act, 2011', চলতি কথায় 'সিঙ্গুর আইন' ঘোষণা করে। আদালতে দীর্ঘ সওয়াল-জবাবের পর কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিসন বেঞ্চ ঐ আইনটিকে অসাংবিধানিক এবং বাতিল (unconstitutional and void) বলে রায় দিয়েছে। বিচারপতিরা তাঁদের রায়ে মূলত চারটি কারণ উপস্থিত করেছেন— (১) সিঙ্গুর আইনে রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষর ছিল না; (২) আইনের ৩, ৪(৩), ৫ এবং ৬ ধারা সরাসরি ১৮৯৪ সালের জমি অধিগ্রহণ আইনের বিরোধী; ৩) সংবিধান অনুযায়ী আইনটি অধিগ্রহণ সম্পর্কিত হলেও অনিচ্ছুক কৃষক বা জমি মালিকদের জমি ফেরত দেওয়ার বিষয়টি জনস্বার্থের অঙ্গীভূত বলা যায় না; ৪) ক্ষতিপূরণের বিষয়টি অস্পষ্ট।

আদালতের রায় ঠিক কি বেঠিক, সে বিচার করবে উচ্চতর আদালত। আমাদের সে বিষয়ে মতামত দেওয়ার অবকাশ কম। আদালতের রায় যে জনসাধারণের চাহিদার সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ হবেই, এমনটা ভাবার কোন কারণ নেই। আদালতই সিঙ্গুরে বলপূর্বক জমি অধিগ্রহণকে বৈধ ঘোষণা করে বলেছিল- "Land is needed by the Government for a public purpose, that is, for setting up of Tata Small Car Project for socio-economic development of the area and the employment generation and so it cannot be urged under any stretch of imagination that the respondent authorities are seeking to acquire the land in question for the Company." (Joydeep Mukherjee and others-vs-State of West Bengal)। সিঙ্গুরের জমি কোন কোম্পানির জন্য নয়, জনস্বার্থেই অধিগৃহীত হয়েছিল। হবেও বা। আমাদের দেশে সাধারণ মানুষ তাদের সাদা চোখে যা দেখে, আইনের চশমা পড়ে আদালত তার থেকে হয়ত অনেক বেশি দেখে। সুতরাং আদালতের প্রশ্ন থাক। আমাদের বিচার্য বিষয় সিঙ্গুর রাজনীতি।

সিঙ্গুরের আন্দোলনটা শুরু হয়েছিল সাধারণ মানুষের নিজস্ব উদ্যোগে। ১৮ মে ২০০৬ তারিখে ২৩৫ জন বিধায়কের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এবং রতন টাটা যৌথ প্রেস কনফারেন্সে সিঙ্গুর প্রকল্প ঘোষণা করেন। ২৫ মে সিঙ্গুর পরিদর্শনগামী টাটার কর্তাব্যক্তিদের গাড়ি যারা অবরুদ্ধ করেছিলেন, তাঁরা ছিলেন একেবারে স্থানীয় মানুষ। কোন রাজনৈতিক দলের অভিভাবকত্ব তাঁদের প্ররোচিত করেনি। আন্দোলন মঞ্চে তদানীন্তন বিরোধী দলনেত্রীর প্রবেশ বেশ কয়েক মাস পরে, অধিগ্রহণের আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া যখন প্রায় সমাপ্ত। আন্দোলনের কর্তৃত্ব বিরোধী দলনেত্রীর হাতে থাকলেও, নানা শক্তির সমাবেশে এবং সমাজের গরিষ্ঠাংশের সমর্থনে সিঙ্গুর আন্দোলন গণ-আন্দোলনে পরিণত হয়। একই কথা নন্দীগ্রামের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যকরী ভূমিকা স্বীকৃত হলেও, শুরু থেকে শেষ— আদ্যন্ত এটা ছিল সাধারণ মানুষের প্রতিরোধ আন্দোলন।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই আন্দোলনগুলিকে ক্ষমতা দখলের সিঁড়ি হিসাবে ব্যবহার করলেন এবং ক্ষমতা দখলের সঙ্গে সঙ্গে আন্দোলনগুলি থেকে 'গণ' চরিত্র মুছে ফেলতে তৎপর হলেন। সামাজিক ক্ষেত্রে এই আন্দোলনগুলির যে এক সার্বিক ভূমিকা আছে, এই আন্দোলনগুলির কিছু সাধারণ বার্তা আছে, আছে কিছু সামাজিক, গণতান্ত্রিক দাবি— এসব তৃণমূল দল বা তাদের নেত্রী মানেন না, ভাবেনও না। আন্দোলনগুলিকে তিনি তাঁর দলীয় সম্পত্তি ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে নারাজ। জঙ্গলমহল আন্দোলন সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য। বাছাই করা কিছু শব্দ, 'দিদি'-র নিজ পছন্দের তালিকায় থাকা কিছু দাবির বাইরে আর সব কিছুই যেন নিষিদ্ধ। সাধারণ মানুষের চাহিদা যে সব দাবির জন্ম দেয়, সে সব দাবি তোলা যাবেনা।

অধিগৃহীত জমি যদি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত না হয়, সেই জমি পূর্বতন মালিকদের ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি একটি অতি পুরাতন এবং সার্বিক দাবি। এই দাবি কেবল সিঙ্গুরেই সীমাবদ্ধ নয়। সমস্ত অধিগ্রহণের ক্ষেত্রেই জমি ফেরতের আকাbখা প্রকাশ পেয়েছে। পুরুলিয়া জেলায় জয় বালাজি কোম্পানির জন্য ২০০৭ সালে ১৭০০ একর জমি অধিগৃহীত হয়েছিল। চার বছর বাদেও, সেই জমিতে শিল্পের চিহ্নও দেখা যায়নি। একরের পর একর অধিগৃহীত জমি ফাঁকা পড়ে আছে। জমিহারা মালিকেরা জেলা প্রশাসনের কাছে জমি ফেরতের দাবি জানায়। (*টেলিগ্রাফ*, ২৯ ডিসেম্বর ২০১১ ও *আনন্দবাজার*, ৬ মে ২০১১)। তৃণমূল মন্ত্রীসভার মন্ত্রী আব্দুল করিম চৌধুরি স্বয়ং অভিযোগ করেছেন, তাঁর নিজ বিধানসভা এলাকা ইসলামপুরে প্রচুর অধিগৃহীত জমি দীর্ঘকাল অব্যবহৃত পড়ে আছে। তিনি মুখ্যমন্ত্রীর নিকট, পূর্বতন মালিকদের জমি ফিরিয়ে দেওয়ার আর্জি জানিয়েছেন (*স্টেটসম্যান*, ২৪ ডিসেম্বর ২০১১)। খড়্গপুরে ১৯৯৫ সালে বিড়লাদের সেঞ্চুরি টেক্সটাইল কোম্পানির জন্য ৫২৫ একর জমি অধিগৃহীত হয়েছিল। ঐ জমিতে পিগ আয়রন কারখানা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বিড়লারা কারখানা করেনি। বাজারে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পাওয়ার দরুন কোম্পানি উক্ত প্রকল্প পরিত্যাগ

করে। সেই জমি দীর্ঘকাল অব্যবহৃত পড়ে ছিল। প্রশ্ন উঠেছে, প্রকল্প বাতিল হলে অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া বাতিল হবেনা কেন? উত্তর প্রদেশে নয়ডায় ৩৮৫ একর জমি শিল্পের জন্য অধিগৃহীত হয়েছিল। কয়েকবছর বাদে, শিল্প না করে সেই জমি প্রমোটার জগতের রাঘব-বোয়ালদের দিয়ে দেওয়া হয় আবাসন প্রকল্পের জন্য। সুপ্রিম কোর্ট পুরো অধিগ্রহণ বাতিল করে প্রাক্তন মালিকদের জমি ফিরিয়ে দেওয়ার আদেশ দেয় (*হিন্দু*, ৭ জুলাই ২০১১)। ঝাড়খন্ডে রাঁচির কাছে 'নাগরি' গ্রামে ৫০ বছর আগে, ১৯৫৭-৫৮ সালে ২২৭ একর জমি অধিগ্রহণ করেছিল তদানীন্তন বিহার সরকার। পাঁচ দশক ধরে সরকার জমিটি ব্যবহার করেনি। দেড়শোর বেশি আদিবাসী পরিবার এতদিন জমিটি চাষ করে আসছিলেন। এখন সরকার জমিটি দখল নেওয়ার উদ্যোগ নিতে গ্রামবাসীরা একজোট হয়ে রুখে দাঁড়িয়েছেন। তাঁরা জমি ফেরতের দাবি তুলেছেন। পশ্চিমবঙ্গে ফরাক্কা বাঁধ কর্তৃপক্ষ ১৯৬৪ সাল থেকে ২৮৮ একর জমি অধিগ্রহণ করে ফেলে রেখেছে। কেন্দ্রীয় সরকার ২০১০ সালে এর মধ্যে ১৮ একর জমি আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাস নির্মাণের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে হস্তান্তর করেছে। ২৫০০ পরিবার এর ফলে উচ্ছেদের সম্মুখীন হয়েছে। বাঁচার তাগিদে এখানেও জমি ফেরতের দাবি উঠেছে। এইসব দাবি কি অসংগত? ২৭ জুলাই ২০১১ তারিখে, কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী জয়রাম রমেশ মহাশয় ওয়েবসাইটে নয়া অধিগ্রহণ আইনের যে খসরা প্রকাশ করেছিলেন, তাতেও বলা হয়েছিল) "When any land or part thereof, acquired under this Act remains unutilised for a period of five years from the date of taking over the possession, the same shall return to the land owner by reversion"। সারা দেশ জুড়েই জমি ফেরতের দাবি উঠছে। সরকারও বিষয়টা নিয়ে ভাবতে বাধ্য হয়েছে। সুতরাং, জমি ফেরতের প্রশ্নটা সিঙ্গুর-কেন্দ্রিক দাবি নয়, এটা সার্বিক নীতিগত প্রশ্ন। সিঙ্গুর আন্দোলন বিষয়টাকে পুনর্বার উত্থাপন করেছে এবং বিষয়টির সার্বিক সমাধান দাবি করেছে। এইমাত্র।

মমতা ব্যানার্জি সমস্যাটির সার্বিক সমাধানের চেষ্টা না করে শুধুমাত্র সিঙ্গুরে সীমাবদ্ধ রাখলেন। তিনি বুঝতে চাইলেন না বা তাঁকে বোঝানো হয়নি যে, টাটার সঙ্গে লীজচুক্তি বাতিল করে জমি পুনরুদ্ধার এবং বাতিল প্রকল্পের জমি মূল মালিকদের প্রত্যর্পণ— দুটি বিষয় চরিত্রের বিচারে মৌলিকভাবে ভিন্ন। টাটার সঙ্গে লীজচুক্তি বাতিল দ্বিপাক্ষিক বিষয় এবং একান্তভাবে টাটা মোটরস প্রকল্পের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। টাটা প্রকল্প পরিত্যাগ করে অন্যত্র একই প্রকল্প নির্মাণ করেছে। সুতরাং সিঙ্গুরে লীজচুক্তি বহাল থাকার কথা নয়। দ্বিপাক্ষিক স্তরে সম্ভব না হলে আদালতের মাধ্যমে এই বিরোধ নিষ্পত্তি করা অসম্ভব ছিলনা। কিন্তু অব্যবহৃত জমি অথবা বাতিল প্রকল্পের জমি ফেরত দেওয়া— এর একটা সাধারণ চরিত্র আছে, যা সমস্ত অধিগ্রহণের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এটা একটা সামাজিক দাবি হলেও এর আইনগত স্বীকৃতি নেই। এক্ষেত্রে প্রয়োজন ছিল একটি সার্বিক আইনের। প্রথম দিকে অধিগ্রহণ আইন (১৮৯৪) সংশোধন করবে, তামিলনাড়ুর অনুসরণে, এইরকম এক আইন প্রণয়ন করার কথা ভাবা হয়েছিল। তৃণমূল দলের বর্তমান সাংসদ শ্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ও অনুরূপ প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কাদের প্ররোচনায় ভাবনা-চিন্তা আমূল বদলে গেল, এটা তদন্ত হওয়া উচিত।

সমস্যাটা হলো, মমতার রাজনীতিতে জনপ্রিয়তা যতটা গুরুত্ব পায় সামাজিক ন্যায় ততটা স্থান পায়না। সিঙ্গুরের রাজনীতিতে তিনি শুধু জনপ্রিয়তাই চেয়েছিলেন। চেয়েছিলেন দ্রুত কিছু চমক। সুবিধাপ্রাপ্তির পরিসরকেও 'ইচ্ছুক-অনিচ্ছুক' ভেদাভেদের মাধ্যমে সঙ্কুচিত করে ফেলেছিলেন। সিঙ্গুর আন্দোলন যখন চলমান ছিল, আন্দোলনের শিবির পক্ষে-বিপক্ষে বিভক্ত ছিল। কিন্তু এটা বোঝা উচিত, অধিগ্রহণ যেখানে জবরদস্তিমূলক, ইচ্ছুক-অনিচ্ছুক ভেদাভেদ সেখানে করা যায়না। সামাজিক ন্যায় বন্টনের প্রশ্নে পক্ষ-বিচার করা আরও বেশি অনুচিত। গণ্ডগোলটা হলো, সিঙ্গুর আন্দোলনকে মমতা ব্যানার্জি দেখছেন দলীয় আন্দোলন রূপে, কৃষক আন্দোলনের শ্রেণী দৃষ্টিতে নয়। তাই সিঙ্গুর আন্দোলন যে গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি দাবি করেছিল, মমতা ব্যানার্জির রাজনীতিতে সেই প্রশ্নগুলি আমল পায়নি।

সিঙ্গুর মামলা তাই, আমার চোখে, নিছক টেকনিকাল প্রশ্নে হারজিতের মামলা নয়। অধিগ্রহণের প্রশ্নে শাসক শ্রেণীর মধ্যেই টানাপোড়েন চলছে। কর্পোরেট পুঁজি অধিগ্রহণ আইনকে জমি-গ্রাসের হাতিয়ারে পরিণত করতে আদাজল খেয়ে লেগে পড়েছে। তাদেরই প্ররোচনায় কেন্দ্রীয় সরকার নয়া অধিগ্রহণ আইনের যে খসড়া সংসদে পেশ করেছে, তা সেই জমি-গ্রাস আইনেরই প্রতিরূপ। কিন্তু শাসক শ্রেণীর একাংশ আবার জনপ্রিয়তার হারানোর ভয়ে আগ্রাসী আইনের খুব একটা পক্ষপাতী নয়। মমতাও মাটি ধরে রাখার তাগিদে, এখনও পর্যন্ত বৃহৎ পুঁজির অনুকূলে জমি অধিগ্রহণে সম্মতি দিচ্ছেন না। কিন্তু কর্পোরেট পুঁজি তো তাদের চাপ ছাড়েনি। তাদের চাপেই তো ভূমি সংস্কার আইন মমতা সংশোধন করলেন। অধিগ্রহণ আইনেও তাদের স্বার্থ বিঘ্নিত হতে পারে, এমন কোন সংশোধনী আনতে দিতে কর্পোরেট পুঁজি রাজি হবে কেন? সরকারের সঙ্গে টাটার লড়াইয়ের আড়ালে আদত লড়াইটা তো বৃহৎ পুঁজির সঙ্গে গ্রামীণ শ্রমজীবী জনগণের।

এই সত্যটা সিঙ্গুরের মানুষকে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। ২০০০ টাকা মাসিক অনুদান আর ২ টাকা কেজি চাল বিলির মাধ্যমে বিক্ষোভের আগুনে জল ঢালার প্রচেষ্টা চলছে। কিন্তু সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামই তো দেখিয়েছে, বিক্ষোভের অগ্নি ব্যাপ্ত হতে শুরু করলে, খয়রাতি সাহায্যে তার উপশম হয়না। সরকার বদলের সঙ্গে সঙ্গে অধিকার আদায়ের সংগ্রামের যে পরিসমাপ্তি ঘটেনা, অধিকার যে কোন সরকারই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে দেয়না, দেবেনা— সেটা আদায়ের জন্য সংগ্রাম চলমান রাখতে হবে, এই সত্যটা সিঙ্গুরের মানুষকে পুনরায় স্মরণ করতে হবে।

[আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য আগ্রহী ব্যক্তিরা, অনীক, জুন ২০১১ সংখ্যায় প্রকাশিত 'জমি ফেরতের বিতর্ক' প্রবন্ধটি দেখতে পারেন। প্রাপ্তিসূত্র- aneekpotrika.wordpress.com]

রিও+২০ বসুন্ধরা সম্মেলন

দীপঙ্কর দে

গত ২০-২২ জুন ব্রাজিলের রিও শহরে অনুষ্ঠিত হলো তৃতীয় বসুন্ধরা সম্মেলন। সম্মেলনে গৃহীত দলিলে যা 'আমরা যে ভবিষ্যৎ চাই' (দ্য ফিউচার উই ওয়ান্ট) শীর্ষক দলিলটি কুড়ি বছর আগের প্রথম বসুন্ধরা সম্মেলনে প্রস্তাবিত এজেন্ডা ২১-র তুলনায় বড্ড ক্লিশে। কিন্তু এবার উক্ত দলিলে 'নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়ন' (sustainable development) প্রক্রিয়ার সর্ব স্তরে সবুজায়নের এক নতুন মাত্রা জুড়ে দেওয়া হলো, যা অদূর ভবিষ্যতে বিশ্ব অর্থ ব্যবস্থায় সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন কায়েম করতে পারে বলে আমাদের আশঙ্কা।

উল্লেখ করা যেতে পারে, দু দশক আগে প্রথম বসুন্ধরা সম্মেলনে 'নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়ন' নামে 'উন্নয়নের' এক নতুন সংজ্ঞার সাথে আমরা পরিচিত হয়েছিলাম। উক্ত তত্ত্বের মূল তিনটে সোপান হলো— অর্থনৈতিক উন্নয়ন, পরিমণ্ডলগত উন্নয়ন ও সামাজিক উন্নয়ন। ভূ-উষ্ণায়নের আশঙ্কাজনিত কারণে স্বভাবতই পরিমণ্ডলগত উন্নয়নের লক্ষ্যে সবুজায়নে জোর দেওয়া হয়। তৃতীয় বসুন্ধরা সম্মেলনে সবুজায়নের পরিধি বাকি দুই ক্ষেত্রেও সম্প্রসারিত হলো।

প্রথম সম্মেলনে পরিবেশ ও জৈববৈচিত্র্য রক্ষার অঙ্গীকার যে স্বপ্নের নির্মাণ করেছিল, তা গত দু দশকে সবুজ প্রযুক্তি ও বায়ু বাণিজ্যের এক নতুন বাজারের (পরিবেশ বাজার— environment market) জন্ম দিয়েছে গোটা বিশ্বে। ১৯৯২ রিও সম্মেলনে মুখ্য ভূমিকায় ছিল মূলত জাপান আর ইউরোপীয় গোষ্ঠী ভুক্ত দেশগুলির রাজনৈতিক নেতৃবর্গ ও পরিবেশবাদী সংগঠনসমূহ। রাজনৈতিক নেতৃত্বকে হটিয়ে চালকের আসনে এখন কর্পোরেট প্রতিনিধিরা। সেবার নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন নির্মাণে কার্যকর ভূমিকা নিয়েছিল এজেন্ডা-২১। এবার তার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। তাই এবছরের রিও +২০ সম্মেলনে মিডিয়ার মাতামাতি নেই, ব্রিটেন, জার্মানি বা আমেরিকার রাষ্ট্রপ্রধানরা শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানে আর উৎসাহিত নন।

বিস্তারিত আলোচনার আগে গত দু দশকে উক্ত তত্ত্বের সুফল কতটা মিললো তা দেখে নেওয়া যাক। পরিসংখ্যান বলছে, এ সময়ে বিশ্বে বায়ু দূষণ বেড়েছে ৪৮ শতাংশ, ৩০ কোটি হেক্টর জঙ্গল বিলুপ্ত হয়েছে। আজও বিশ্বের প্রতি ৫ জনের মধ্যে ১ জন (১০০ কোটিরও বেশি) সীমাহীন দারিদ্র্যের শিকার। প্রতি ৬ জনে ১ জন অপুষ্টিতে ভুগছে। কিন্তু ২০১০ সালেই বিশ্ব পরিবেশ বাজারের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে আনুমানিক ৬৮৮০০ কোটি ডলার, ২০১৫ সালে পরিমাণটি ৮০ হাজার কোটি ডলার অতিক্রম করবে বলে ধারণা।

প্রথম বসুন্ধরা সম্মেলনের প্রেক্ষাপট

১৯৯২ সালে রিও-তে প্রথম সম্মেলনের মূল উদ্যোক্তা ছিল পশ্চিম ইউরোপ ও জাপান। উদ্দেশ্য বিশ্ব বাজারে মার্কিনদের একচেটিয়া আধিপত্য খর্ব করা। গত শতকের আশির দশকে পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তির পর পশ্চিম ইউরোপের রাজনৈতিক নেতৃত্ব নতুন উদ্যমে তাদের হৃত গৌরব ফিরে পাওয়ার লক্ষ্যে তিনটি সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা করেছিল। (১) এক শক্তিশালী ইউরোপ গঠনের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা; (২) বিশ্ব বাজারে মার্কিনিদের দাদাগিরি ঠেকাতে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ; আর (৩) মার্কিন ডলারের একচেটিয়া ক্ষমতা হ্রাস করতে ইউরোপের নিজস্ব মুদ্রা ইউরোর প্রচলন। ১৯৯২-এর প্রথম বসুন্ধরা সম্মেলন এই পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োগ। ব্যাখ্যা করা যাক।

মার্কিন ডলারের মূল ভিত্তি খনিজ তেলের ক্রমবর্ধমান চাহিদা। কী ভাবে? ১৯৭৩ সালে মধ্যপ্রাচ্যে জোর লড়াই বাধে। সে সুযোগ মার্কিনরা সৌদি রাজ পরিবারকে সুরক্ষাদানের গ্যারান্টির বিনিময়ে এক দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি করে। সেই চুক্তি মতে আজও সারা বিশ্বে ওপেক (OPEC) তেলের যাবতীয় লেনদেন হয় মার্কিন ডলারে। খনিজ তেলের চাহিদা যত বাড়ে ডলারের মূল্য তত বাড়ে। এই শক্তিমান ডলারের মাধ্যমে মার্কিনিরা সারা পৃথিবীতে ছড়ি ঘোরায়। তাই মার্কিনিদের কাবু করার প্রাথমিক শর্ত ডলারের মূল্যহ্রাস এবং তা সম্ভব বিশ্বে খনিজ তেলের চাহিদা কমাতে পারলে। আরও কিছু কারণে জাপান ও পশ্চিম ইউরোপ চাইছিল জ্বালানি শিল্পে খনিজ তেলের পরিবর্তে অপ্রচলিত শক্তির ব্যবহার জনপ্রিয় করতে। কারণগুলো হলো : (১) ইউরোপ ও জাপানে খনিজ তেলের ঘাটতি; (২) ১৯৮৬ সালের চেরনোবিল দুর্ঘটনার পর পারমাণবিক শক্তির প্রতি মোহভঙ্গ। স্মরণ থাকতে পারে, রিও বসুন্ধরা সম্মেলন 'নিরবচ্ছিন্ন' উন্নয়নের স্বপ্ন দেখালেও মূল ফোকাসটা ছিল খনিজ তেল ব্যবহারের সাথে ভূ-উষ্ণায়ণের সম্পর্ক স্থাপনের উদ্যোগ। ভূ-উষ্ণায়ণের কারণ নির্মাণে রাষ্ট্রপুঞ্জের আওতায় ১৯৮৮ সালেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আইপিসিসি, বসুন্ধরা সম্মেলনে এ বার জন্ম নিল UNFCCC। এই নতুন প্রতিষ্ঠানটি যেন স্থাপিতই হয়েছিল ভূ-উষ্ণায়ণের সংজ্ঞা বদলাতে। এ প্রশ্নে উক্ত দুই প্রতিষ্ঠানের (প্রথমটি মার্কিন উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত) বক্তব্য কী?

IPCC and UNFCCC differ in their definition on climate change. Climate change in IPCC usage 'refers to any change in climate over time, whether due to natural variability or as a result of

human activity.' This usage differs from that in the UN Framework. Convention on Climate Change (UNFCCC), where 'climate change refers to a change of climate that is attributed directly or indirectly to human activity that alters the composition of the global atmosphere and that is in addition to natural climate, variability observed over comparable time periods.' [Summary for Policy Makers: The Science of Climate Change - IPCC Working Group 1, p.5 (foot notes)]

UNFCCC-র কল্যাণে ভূ-উষ্ণায়ণের সাথে মনুষ্য-সৃষ্ট গ্রিন হাউস গ্যাস সরাসরি সম্পর্কিত হয়ে উঠলো স্রেফ সংজ্ঞা পরিবর্তনের মাধ্যমে। রাম না জন্মাতেই রামায়ণ লেখা হয়ে গেল এবং তৈরি হলো এক বিরাট কার্বন বাজার।

প্রথম বসুন্ধরা সম্মেলনের আগেকার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা:

১৯৮৬ চেরনোবিল দুর্ঘটনা

১৯৮৬ উরুগুয়ে রাউন্ডের সূচনা, যা পরবর্তীতে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা প্রতিষ্ঠার পূর্ববর্তী অধ্যায়

১৯৮৭ সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের পতন

১৯৮৭ নরওয়ের প্রধানমন্ত্রীর নামাঙ্কিত ব্রুন্দতলান্দ রিপোর্ট 'আওয়ার কমন ফিউচার' প্রকাশ

১৯৮৭ মন্ট্রিল প্রটোকল স্বাক্ষর

১৯৮৯ দুই জার্মানির মিলন

১৯৮৯ ডেলর্স প্রণীত 'রিপোর্ট অন ইকনমিক অ্যান্ড মনিটারি ইউনিয়ন ইন দ্য ইউরোপিয়ান কমিউনিটি' প্রকাশ। ১৯৯৯- তে অভিন্ন মুদ্রা 'ইউরো' প্রবর্তনের ঘোষণা

১৯৯১ ফরাসি অর্থনীতিবিদ আর্থার দাঙ্কেল প্রণীত বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার খসড়া প্রস্তাব প্রকাশ

উপরি-উক্ত প্রতিটি ঘটনা/পদক্ষেপ কোন না কোন ভাবে বসুন্ধরা সম্মেলনের পথ প্রশস্ত করেছে। প্রশ্ন হচ্ছে, খনিজ তেল, ভূ-উষ্ণায়ণ ও ডলারের জোরালো সম্পর্ক দুর্বল করতে না হয় UNFCCC সৃষ্টি হলো, কিন্তু জৈববৈচিত্র্য রক্ষার কোন্ তাগিদ ছিল ইউরোপ বা জাপানের? সম্মেলনের শেষ পর্যায়ে জীব বৈচিত্র রক্ষার্থে কনভেনশন (কনভেনশন অন বায়ো ডাইভার্সিটি - সিবিডি) স্বাক্ষরিত হওয়ার তিনটি সম্ভাব্য কারণ হলো:

১। উন্নত দেশের (ইউরোপ বনাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) বাজার দখলের লড়াইয়ে UNFCCC-র প্রতিষ্ঠা হলো, কিন্তু ব্রাজিল, ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকার মতো দেশ কী পেল শিখর সম্মেলনে? বিশ্ব বাজার দখলের লড়াইয়ে তাদের সহযোগিতাও প্রয়োজন। রিও সম্মেলনে ১৯১টি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা উপস্থিত ছিলেন, যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই ছিল উন্নয়নশীল দেশের প্রতিনিধি। এশিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকা জৈব সম্পদের আকরভূমি। সিবিডি জৈব বৈচিত্র্য রক্ষায় কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। তাই, আমাদেরও কিছু প্রাপ্তি হলো।

২। কৃষি ও খাদ্য বাজারের বহুজাতিক কারবারিরা চেয়েছে জীববৈচিত্র্য রক্ষিত হোক তাদেরই স্বার্থে। ভবিষ্যতের জিন পরিবর্তিত খাদ্যের জিন সরবরাহ হবে আফ্রিকা, এশিয়া বা দক্ষিণ আমেরিকার জীব সম্পদভূমি (Biodiversity hot spots) থেকেই। ভারতের কৃষি গবেষণা কেন্দ্র এমন 'উন্নত গবেষণার' স্বার্থে তাদের বিশাল বীজ বাজার কুখ্যাত জি-এম বীজ কারবারি মনসান্টোর হাতে তুলে দিতে চাইছেন। শুনলে আশ্চর্য লাগতে পারে আমেরিকান মিউজিয়াম অফ ন্যাচারাল হিস্ট্রি-তে বায়োডাইভার্সিটি হলের পৃষ্ঠপোষকের নাম মনসান্টো। তাই জৈববৈচিত্র্য রক্ষায় সিনজেন্টা মনসান্টোর মতো পশ্চিমি বহুজাতিকে ব্যবসায়িক স্বার্থ নিশ্চয়ই আছে।

৩। ১৯৯২ রিও সম্মেলনে সিবিডি স্বাক্ষরিত হওয়ার আগেই ১৯৯১ সালে দাঙ্কেল সাহেব বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা প্রতিষ্ঠার খসড়া প্রস্তাব তৈরি করে ফেলেন। অন্যান্য কয়েকটি নতুন চুক্তির সাথে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 'মেধাচুক্তি' (TRIPS) তাতে সামিল হয়। উদ্যোক্তারা জানতেন, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা প্রতিষ্ঠার পর TRIPS সিবিডি-কে ভোঁতা করে দেবে। সিবিডি বাণিজ্যিক স্বার্থে ঘা দিতে পারবে না কিন্তু জৈববৈচিত্র্য রক্ষায় সাহায্য করবে। স্নানও হবে, আবার বেণীও ভিজবে না। বাস্তবে তাই হলো।

পরবর্তী দু দশক

নির্ধারিত সময়ে ১৯৯৩ সালে সরাসরি ভাবে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন গঠিত হলো আর ১৯৯৫ সালে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা। নতুন বাজারের সন্ধান পেয়ে আটলান্টিকের দু পারের ব্যবসায়িক সংগঠনগুলো যেমন World Industy Council for Environment ও Business Council for Sustainable Development ১৯৯৫ সালে একজোট হলো World Business Council for Sustainable Development নামে। ডাও কেমিক্যাল, দুপঁ-র মতো 'বিশিষ্ট' সদস্যরাই এমন সবুজায়ন ও 'নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়নের' কাণ্ডারী।

এদিকে UNFCCC কার্যভার গ্রহণ করার পর ১৯৯৭ সালে জাপানের কিয়োটো শহরে ভূ-উষ্ণায়ণ রোধে এক গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নেওয়া হয়, যা কিয়োটো প্রটোকল নাম পরিচিত। ক্লিন্টন সাহেব এই উদ্যোগে সায় দিলেন খানিকটা রাজনৈতিক স্বার্থেই। রিপাবলিকানরা খনিজ তেল শিল্পের পৃষ্ঠপোষক। ভূ-উষ্ণায়ণের প্রশ্নে রিপাবলিকানদেরও এই সুযোগে একটু কোণঠাসা করা যায়। পরবর্তীতে মার্কিন কংগ্রেস কিয়োটো প্রটোকলে সায় দিল না। শেষে নানা হিসেবনিকেশের পর ২০০৫ সালে কিয়োটো প্রটোকল বাস্তবায়িত হয়, এবং এক বছরের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাদে ১৬৯টি দেশ এই উদ্যোগে সামিল হয়। ১৯৯৯ সালে

ইউরোর প্রবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ভূ-উষ্ণায়ণ রোধে ইউরোপীয় গোষ্ঠীর এই নয়া উদ্যোগে সামিল হওয়াকে সঙ্গত কারণেই মার্কিন সরকার তাদের পেট্রো-ডলার সাম্রাজ্যের একচেটিয়া আধিপত্যের বিরুদ্ধে এক অশুভ চক্রান্ত বলে গণ্য করে। তাই সাদ্দাম হুসেন ইরাকে তেলের লেনদেন ডলারের বদলে ইউরোয় করতে চাইলে মার্কিন সরকার তাকে উচিত শিক্ষা দেয়।

২০০২ সালে রিও +১০ জোহানসবার্গে অনুষ্ঠিত হলো। কিয়োটো প্রটোকল অন্তর্ভুক্ত 'পরিচ্ছন্ন উন্নয়ন প্রক্রিয়া' (সিডিএম)-এর কল্যাণে সবুজ প্রযুক্তির চাহিদা বাড়তে থাকে। দূষণ শিল্প স্থানান্তরিত হয় ভারত চীনের মতো উন্নয়নশীল দেশে, যা কিয়োটো প্রটোকলের আওতাভুক্ত নয়। চীন, তাইওয়ান, দক্ষিণ কোরিয়া সহ পূর্ব এশিয়া হয়ে ওঠে পৃথিবীর প্রধান পণ্য উৎপাদন কেন্দ্র। চীনে উৎপাদিত পণ্য ছড়িয়ে পড়ে সারা পৃথিবীতে। দিন দিন শক্তিশালী হয় ইউয়ান। ইউরোর প্রতিদ্বন্দ্বী সে। তিরিশ বছর আগে চীনের এই উত্থান কল্পনা করেনি জাপান ও পশ্চিম ইউরোপ। তারা শুধু মার্কিনিদের সাথে লড়াই করার কথাই ভেবেছে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা থেকে কিয়োটো প্রটোকল সর্বত্রই চীন তাদের সব হিসেব উলটে দিয়েছে। ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন নিজেদেরই সৃষ্ট প্রতিষ্ঠানে যেন বন্দী। ভেঙ্গে বের হতে পারলে বাঁচে। কিয়োটো প্রটোকলের মতো বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার দোহা ডেভলপমেন্ট এজেন্ডা আবার বিশ বাঁও জলে।

২০০৮ সালের মন্দা সংকটকে আরও বাড়িয়েছে। যদিও সংকটের সূত্রপাত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তারা খানিকটা সামলে নিয়েছে। মার্কিন ডলারের মূল্য কমেনি, বরং বেড়েছে। ইউরোপের এই সংকটে মার্কিনিরা আরও একটু গুছিয়ে নিয়েছে। পরমাণু শক্তি ও জি-এম বীজকে সবুজ প্রযুক্তি বলে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলছে। কিয়োটো সমঝোতাকে পাশ কাটিয়ে পৃথিবীর কার্বন বাজার নিজেদের কব্জায় আনার চেষ্টা করছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। CERs (Certified Emission Reduction)-এর সমান্তরাল VERs (Verified Emission Reduction)-এর লেনদেন শুরু হয়েছে সে দেশে। ১৯৯২ সালে বসুন্ধরা সম্মেলনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিক্ষোভের মুখে পড়েছিলেন। ২০০৯ সালে কোপেনহেগেনে ওবামা সাহেব পৌঁছেছিলেন নোবেল শান্তি পুরস্কারে ভূষিত হয়ে। এক ধাক্কায় কিয়োটো প্রটোকলকে পাশ কাটিয়ে বায়ু দূষণ রোধে কোনও অবশ্যকরণীয় (binding) অঙ্গীকার না করেও কার্বন বাণিজ্যের বাজার বিশ্বব্যাপী বিস্তার করেছেন ভারত, চীন, ব্রাজিলের মতো উন্নয়নশীল দেশকে সাথী করে। (বিস্তারিত জানতে দেখুন অনীক, জানু- ফেব্রু ২০১০)

রিও +২০

গত দু দশকে বদলে গেছে রাজনৈতিক সমীকরণ। UNFCCC, কিয়োটো প্রটোকল— এগুলির প্রয়োজন ফুরিয়েছে। উদ্যোক্তাদের নাজেহাল অবস্থা আজ। কিন্তু বেহাল অর্থনীতির হাল ফেরাতে চাই নতুন বাজার। সবুজ অর্থব্যবস্থার (Green Economy) বিস্তার এ সংকট মোকাবিলায় সাহায্য করতে পারে এই আশায় বুক বেঁধেছে পশ্চিমি দুনিয়া। সঙ্গী হয়েছে নব্য ধনী চীন, ভারত, ব্রাজিলের মতো (BRICS) দেশসমূহ।

সর্বস্তরে সবুজ অর্থব্যবস্থার নির্মাণে রিও +২০ বসুন্ধরা সম্মেলনের মঞ্চকেই বেছে নেওয়া হলো। সম্মেলনের ৬ মাস আগে (ডিসেম্বর ২০১১) ইউনাইটেড নেশনস এনভায়রনমেন্ট ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ দু শতাধিক পাতার এক বিস্তারিত পরিকল্পনা পেশ করেন। সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবের ('যে ভবিষ্যৎ আমরা চাই') মূল ভিত্তি হচ্ছে এই রিপোর্ট। যদিও বলা যেতে পারে, উক্ত পরিকল্পনার রূপরেখা রাষ্ট্রপুঞ্জ ২০০৯ সালেই স্থির করেছিলেন Green Economy : A Transformation to Address Multiple Crisis নামের এক দলিলে।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে সর্বশেষ বসুন্ধরা সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবে সবুজায়নের পরিধি 'নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়নের' বাকি দুই স্লোগান অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে বিস্তারিত হয়েছে। আরও উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ভূ-উষ্ণায়ণের সাথে দারিদ্র দূরীকরণেও প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এবার সম্মেলনের প্রধান দুই আলোচ্য বিষয় ছিলঃ (১) নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়ন ও দারিদ্র দূরীকরণের পরিপ্রেক্ষিতে সবুজ অর্থনীতি; (২) নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়নের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো।

সমস্যা এখান থেকেই শুরু। উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া সবুজায়নের এই প্রয়াস কতটা সবুজ করবে আমাদের? প্রস্তাবে এই বলা হয়েছে, খাদ্যাভ্যাস থেকে শিক্ষা, কৃষি থেকে শিল্প, জীবনযাত্রা (লাইফস্টাইল) থেকে যানবাহন— আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার প্রতিটি ক্ষেত্রকে সবুজায়নের সাথে সংযুক্ত করতে হবে। সবুজায়নের এই স্বপ্ন বাস্তবায়িত করবে কে? —'a dynamic, inclusive, well-functioning, socially and environmentally responsible private sector'। কর্মযজ্ঞের বিপুল অর্থ ও প্রযুক্তি যোগাবে কে? —আইএমএফ, বিশ্ব ব্যাংক তথা পশ্চিমি বহুজাতিক সংস্থাগুলি। নতুন বোতলে পুরনো মদ! কেউ প্রশ্ন তুলতেই পারেন— সবই যদি সবুজ হয়— ভালোই তো! হলে হয়তো ভালোই হতো। উন্নয়নশীল না হয়ে সবাই উন্নত হলে যেমন ভালো হতো। পৃথিবীটা এতদিন বিভাজিত ছিল উন্নত আর উন্নয়নশীল/অনুন্নত দেশে। এবার বিভাজিত হবে 'সবুজ' আর 'নীলে'। সবুজায়নের নামে আমরা নীল হবো। আরও সবুজ হবে পশ্চিম দুনিয়া। উন্নত বাজারের সবুজ ক্রেতার জন্য উৎপন্ন হবে জৈব খাদ্য, ব্যবহার হবে বৃষ্টির মিষ্টি জল, জৈব সার। রপ্তানিযোগ্য পণ তৈরি হবে ঝাঁ চকচকে কারখানায়- সবুজ প্রযুক্তিতে। আর বাকি হতভাগাদের জন্য নোনা জমিতে, আর্সেনিক মেশা জলে, রাসায়নিক সার আর কীটনাশক প্রয়োগে জিন-পরিবর্তিত বীজে উৎপন্ন হবে সস্তার দৈনন্দিন আহার। মহাদেবের মতো 'নীলকণ্ঠ' হবে তারা।

ঘটনাপ্রবাহ

সিপিআই(এম)-এর ঝুলি থেকে বিড়ালটা আবার বেরিয়ে পড়লো!

প্রবীণ রায়

বিড়াল জন্তুটা বড্ডো গোলমেলে! যতই ঢেকেঢুকে তাকে ঝুলির মধ্যে লুকিয়ে রাখো, ফাঁক পেলেই সে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়ে। যেমন সম্প্রতি আবার ঘটলো সিপিআই(এম)-এর ক্ষেত্রে। জন্মলগ্ন থেকেই সিপিআই(এম) নেতারা মুখে বলে আসছেন যে, তাঁরা শান্তিপূর্ণ সংসদীয় পথে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের সংশোধনীবাদী ক্রুশ্চভীয় লাইনের বিরোধী, তাই তাঁদের কর্মসূচিতে সংসদীয় ও সংসদ-বহির্ভূত সংগ্রামের সমন্বয় ঘটিয়ে ক্ষমতা দখলের লাইন উপস্থাপিত করা হয়েছে।

তবে বিভিন্ন কারণে প্রথম থেকেই নেতৃত্বের আন্তরিকতা ও প্রকৃত উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন ছিল। লেনিন সংসদ-বহির্ভূত সংগ্রামকেই সংসদীয় কাজের ক্ষেত্রেও নির্ধারক ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত করার উপর বার বার গুরুত্ব দিয়ে বক্তব্য রেখেছেন। কিন্তু সিপিআই(এম) নেতারা তাঁদের সংসদীয় ও সংসদ-বহির্ভূত কার্যকলাপের মধ্যে কোন্‌টি নির্ধারক ভূমিকা নেবে, সেই প্রশ্নটি ধারাবাহিকভাবে এড়িয়ে গেছেন; এবং ভিতরে ভিতরে তাঁদের সূচনাপর্বে-পরিত্যক্ত সংসদীয় কানাগলির পথেই যাত্রা করার প্রস্তুতি নিয়ে গেছেন। বার বার নানা ঘটনা ও কার্যকলাপের মধ্যে দিয়ে তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত মিলেছে। তারপর যত দিন গেছে ততোই, পার্টির অনুসৃত নীতি, বাস্তব কার্যকলাপ এবং বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে ১৯৬৭ ও ১৯৬৯-৭০-এর যুক্তফ্রন্ট সরকার ও ১৯৭৭-২০১১-র বামফ্রন্ট সরকারের ক্রমাগত অধঃপতন ও ক্রমবর্ধমান স্বৈরতান্ত্রিক চরিত্রের নির্লজ্জ প্রকাশের মধ্যে দিয়ে বার বার 'লুকিয়ে রাখা' মস্কোপন্থী সংসদীয় লাইনের *বিড়ালটি* বেরিয়ে পড়েছে (এ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনায় যাচ্ছি না, কারণ এই পত্রিকারই মে'২০১২ সংখ্যায় প্রকাশিত 'প্রসঙ্গ : সিপিআইএম-এর সাম্প্রতিক মতাদর্শগত সিদ্ধান্ত' লেখাটিতে তার বিস্তৃত আলোচনা করেছি)।

সেই লেখাতেই দেখিয়েছিলাম, সেই বিড়ালটিকে নতুন করে ঢেকেঢুকে লুকিয়ে রাখার অভীপ্সায় গত এপ্রিল'১২-তে অনুষ্ঠিত এই দলটির পার্টি-কংগ্রেসে গৃহীত মতাদর্শগত সিদ্ধান্তে এতদিন অনুসৃত সেই সুস্পষ্ট সংসদ-সর্বস্ব সংশোধনবাদী লাইন থেকে 'দূরত্ব তৈরি করার' নতুন করে আর একবার তাত্ত্বিকভাবে আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়েছে। সেই সিদ্ধান্তে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও নাগরিকদের গণতান্ত্রিক অধিকার সংরক্ষণ ও প্রসারণের লড়াইকে বুর্জোয়া-জমিদার রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ও জনগণতন্ত্রের অধীনে উচ্চতর পর্যায়ে উত্তরণেরই অঙ্গ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে; এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে সংসদীয় ও সংসদ-বহির্ভূত কাজের একটি যথোপযুক্ত সমন্বয় গড়ে তোলাকে এবং এই দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতেই সংসদীয় মঞ্চের কাজকে গণআন্দোলন গড়ে তোলার জন্য ব্যবহার করাকে "পার্টির সামনে একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হিসেবে" অভিহিত করা হয়েছে। আরো বলা হয়েছে : সংসদীয় সংগ্রামকে সমন্বিত করতে হবে সংসদ-বহির্ভূত কাজ এবং বিরাজমান বুর্জোয়া-জমিদার রাষ্ট্রের বিকল্প জমানা গড়ে তোলার সংগ্রামের সঙ্গে। সেটা করতে গিয়ে সম্ভাব্য বিচ্যুতির বিরুদ্ধে সতর্কতা বজায় রাখার কথাও বলা হয়েছে, কেননা "সংসদীয় গণতন্ত্র জনগণের মধ্যে, বিশেষত রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধের মাধ্যমে এমন সব মোহের জন্ম দিতে পারে, যা শ্রেণী ও গণসংগ্রামকে স্তব্ধ বা দুর্বল করে দিতে পারে"... "তাছাড়াও সংসদীয় পথে উত্তরণের মোহও শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে... সংসদীয় সংগ্রামের সাথে সংসদ-বহির্ভূত কাজের কার্যকর সমন্বয়ের জন্য সংসদীয়বাদ ও সংসদীয় মোহের বিরুদ্ধে সতর্কতা বজায় রাখা দরকার।"

কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে, শ্রেণী-সংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষ আজ আর শুধু মুখের কথায় চিড়ে ভেজানোর সম্ভাব্যতা স্বীকার করে না, বরং কথায় ও কাজে মিল খোঁজে, বাস্তব অনুশীলনের সাথে কথাকে মিলিয়ে নিতে চায়। তাই এই মতাদর্শগত সিদ্ধান্ত গৃহীত হবার তিন মাসের মধ্যেই ঘোষিত তত্ত্ব ও বাস্তব কাজের দ্বিচারিতা নতুন করে প্রকট হয়ে পড়ায়, অর্থাৎ আমাদের পূর্ব-বর্ণিত *বিড়ালটি* আবার বেরিয়ে পড়ায় পার্টি-নেতৃত্ব সত্যিই একটু বেকায়দায় পড়ে গেছেন। বিশেষত মাত্র এক বছর আগেই যখন সিপিআই(এম)-নেতৃত্বাধীন সংসদীয় বামপন্থী শিবির এক বিরাট ধাক্কা খেয়েছে; কেরালা তো বটেই, ৩৪ বছর ধরে তাদের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণাধীন পশ্চিমবঙ্গে পর্যন্ত তাদের শোচনীয় পরাজয় ঘটেছে, এবং সিপিআই(এম)-নেতৃত্ব তাদের সদ্যসমাপ্ত পার্টি-কংগ্রেসেও এই পশ্চাদপসরণের কোনো সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা তুলে ধরতে পারেন নি।

অন্য দিকে জাতীয় প্রেক্ষিতে সিপিআই(এম)-নেতৃত্বের মস্কোপন্থী সংসদীয় লাইনে ধারাবাহিক যাত্রার আর একটি দৃষ্টান্তও আমাদের আলোচনার ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক হবে। তাঁরা জাতীয় স্তরে সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য তথা পুঁজির আগ্রাসী অভিযান প্রতিহত করার লক্ষ্যে নেতৃত্ব এমন এক ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক বিকল্প গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন, যা "গণতন্ত্র, জাতীয় সার্বভৌমত্ব, ধর্ম-নিরপেক্ষতা, যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি এবং জনগণের জীবিকা ও অধিকার রক্ষার" ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা নিতে পারবে, এবং সাম্প্রদায়িকতা, জাত-পাতভিত্তিক রাজনীতি, আঞ্চলিকতাবাদ প্রভৃতির বিরুদ্ধে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে তুলবে। বাস্তবে কিন্তু আমরা দেখেছি, তাঁদের সেই 'ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক বিকল্প'-এর লক্ষ্যে যুক্ত মোর্চা গড়ে তোলার সামান্যতম চেষ্টা তো করেনই নি, বরং বিভিন্ন সময়ে বারংবার তাঁরা এক তথাকথিত 'তৃতীয় ফ্রন্ট' গড়ে

তোলার আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়েছেন বিএসপি, সোস্যালিস্ট দল, ডিএমকে, এআইডিএমকে, টিডিপি প্রভৃতি দলের সঙ্গে— যাদের অস্তিত্বই নির্ভর করছে জাত-পাতভিত্তিক রাজনীতি, আঞ্চলিকতা-বাদ প্রভৃতি তাঁদেরই মতে ক্ষতিকর প্রবণতার উপর। এটা কি পরস্পর-বিরোধিতা নয়? তাঁরা মতাদর্শগতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে চলেছেন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বাম ও গণতান্ত্রিক বিপ্লবী ঐক্যবদ্ধ মোর্চা গড়ার, আর বাস্তবে প্রতিনিয়ত চেষ্টা চালাচ্ছেন ভোটের জোট তৈরির। তাহলে, আসলে তাঁরা কি বিপ্লবী ঐক্য বা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মোর্চার বদলে সংসদীয় মোর্চা গড়ে তোলাটাকেই অনেক বেশি প্রাধান্য দিচ্ছেন না? এরপরেও কি ওই পার্টিটিকে 'বিপ্লবী' আখ্যা দেওয়া যায়!

এরকমই একটি নতুন দৃষ্টান্ত সিপিআই(এম)-নেতৃত্ব এবার স্থাপন করলেন ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রেক্ষিতে। বাস্তব পরিস্থিতি থেকে ইতিমধ্যেই স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, 'সাম্প্রদায়িক বিজেপি-কে প্রতিহত করার জন্য' সিপিআই(এম)-এর সমর্থনের কোনো দরকার নেই, শাসকগাষ্ঠী ইউপিএ-র মধ্যেকার অন্তর্কলহ সত্ত্বেও এই নির্বাচনে সদ্য-পদত্যাগী অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় স্বচ্ছন্দে সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হতে চলেছেন। তবু সিপিআই(এম)-এর সর্বোচ্চ নেতৃত্ব (পলিটব্যুরো) সেই প্রণববাবুকে সমর্থন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, যিনি গত চার বছর ধরে ভারত্রীয় অর্থনীতির সারথীর ভূমিকা পালন করেছেন। সিপিআই(এম)-এর বহু-বিঘোষিত অবস্থানই হচ্ছে নয়া উদার-বাদী অর্থনৈতিক পন্থার, অর্থাৎ পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ এবং কর্পোরেট পুঁজির স্বার্থে প্রণীত ও পরিচালিত বিশ্বায়ন কর্মসূচির মৌলিক বিরোধিতা। এই দলটি ভারতে এই নয়া উদারবাদী অর্থনৈতিক পন্থা ও বিশ্বায়ন কর্মসূচির বাস্তবায়নের প্রতিটি পদক্ষেপেরই প্রকাশ্যে বিরোধিতা করে। এর বিপরীতে গত চার বছর ধরে সেই বাস্তবায়নের দায়িত্বটিই বিশ্বস্তভাবে যথাসাধ্য পালন করে গেছেন প্রণববাবু দেশের অর্থমন্ত্রী হিসেবে। তার আগে বাণিজ্যমন্ত্রী হিসেবেই শুধু একই কাজ যে তিনি করে গেছেন তাই নয়, ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রী হিসেবে ভারতের পক্ষে বিশ্ব বাণিজ্য চুক্তিতে (ডাবলিউটিও) স্বাক্ষর করে তিনিই বিশ্বায়ন কর্মসূচির মূল হাঁড়িকাঠে ভারতের গলাটা বাড়িয়ে দেওয়ার প্রাথমিক পদক্ষেপটি গ্রহণ করার গৌরবও অর্জন করেছেন। ফলত তাঁকে আগ বাড়িয়ে সমর্থন করার অর্থই দাঁড়ায় এই যে, ডালমে কুছ কালা হ্যায়; সিপিআই(এম)-এর নয়া উদারবাদী অর্থনৈতিক পন্থা ও বিশ্বায়ন কর্মসূচির বাস্তবায়নের সোচ্চার বিরোধিতাটা আসলে নেহাৎই লোক-দেখানো।

আগেও অবশ্য বার বার এর প্রমাণ মিলেছে। পার্টি প্রকাশ্যে ১৮৯৪-এর জমি অধিগ্রহণ আইন বাতিল করার দাবি তুলেছে; সিঙ্গুরে এই আইন ব্যবহার করেই তাদের সরকার কৃষকদের জমি কেড়ে নিয়েছে। পার্টি বিশ্বায়নের অঙ্গ *সেজ*-এর বিরুদ্ধে অবস্থান ঘোষণা করেছে; নন্দীগ্রামে *সেজ*-এর বিরোধিতা করার 'অপরাধে' সেখানকার সংগ্রামী কৃষকদের অত্যাচার ও হত্যা করা হয়েছে। পার্টি পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিরোধিতা করেছে; এই রাজ্যে হরিপুরে শেষ দিন পর্যন্ত তাদের সরকার পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছে। পার্টি ব্যাপক মেহনতি মানুষের কাছে গণতন্ত্রের স্বাদ পৌঁছে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে; বাস্তবে 'বাম' মোড়কে এক নতুন ধরনের স্বৈরতন্ত্র পার্টিতন্ত্রের মাকড়শার জাল ছড়িয়ে দিয়ে পার্টি, পুলিশ ও প্রশাসনের এক বেনজির সমীকরণের মাধ্যমে, মূলত গ্রামে-গঞ্জে এবং অনেক পরিমাণে শহরাঞ্চলেও, গড়ে তোলা হয়েছে। সেই প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো দূরের কথা, সামান্য প্রতিবাদ জানাবার 'অপরাধেই' বহু মানুষকে প্রচণ্ড অপদস্থ, আক্রান্ত ও বিপন্ন হতে হয়েছে। ফলে নিশ্ছিদ্র নিস্তব্ধতা ও প্রতিবাদহীনতার এক দুঃসহ পরিবেশ সমাজে কায়েম হয়ে গেছে। জাতীয় স্তরে নেতৃত্ব সাম্রাজ্যবাদ-নিয়ন্ত্রিত বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার তারস্বরে বিরোধিতা করেছেন, অথচ তাদের শাসিত বিভিন্ন রাজ্যে গণআন্দোলনকে গলা টিপে হত্যা করে সেই সাম্রাজ্যবাদী উন্নয়নের পথই তাঁরা অনুসরণ করেছেন, এবং কেন্দ্রীয় নেতৃত্বও কার্যত সেই লাইন মেনে নিয়েছেন। এবার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রেক্ষিতে সিপিআই(এম) নেতৃত্ব মতাদর্শগত দ্বিচারিতার সেই ধারাবাহিক দৃষ্টান্তমালার তালিকায় আর একটি নতুন সংযোজন ঘটিয়ে নিজেদের বামপন্থী মতাদর্শ থেকে মৌলিক বিচ্যুতির প্রমাণ রাখলেন।

কিন্তু এই প্রতিবেদনের শুরুতে যা বলেছিলাম, সে কথাই আবার বলতে চাই। সদ্য-পরিমার্জিত মতাদর্শগত দলিলে সংসদীয় নির্বাচনের তুলনায় সমাজ-বদলের প্রস্তুতিমূলক গণসংগ্রামের উপর নতুন করে গুরুত্ব দেবার যতোই ভাবভঙ্গি করা হোক না কেন, ঝুলির মধ্যে লুকিয়ে রাখা সংসদীয় পথের সেই *বিড়ালটা* বহাল তবিয়তেই বিরাজ করছে। কেননা, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে তাদের অবস্থানের সাফাই গাইতে গিয়ে স্বয়ং প্রকাশ কারাট থেকে শুরু করে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য পর্যন্ত সামনের সারির নেতারা যুক্তি দিয়েছেন যে, মূলত পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস তথা মমতা ব্যানার্জীর সাথে শাসক কংগ্রেস দলের দ্বন্দ্ব বাড়িয়ে তোলার (অর্থাৎ আবার ওই রাজ্যে ক্ষমতার মসনদে বসার পরিস্থিতি গড়ে তোলার) লক্ষ্যেই তাঁরা প্রণববাবুকে সমর্থনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। অর্থাৎ মূল কথাটা হচ্ছে এটাই যে, নয়া উদারবাদী অর্থনৈতিক পন্থা ও বিশ্বায়ন কর্মসূচির বিরুদ্ধে গণসংগ্রাম গড়ে তোলা নয় (কারণ, তাহলে তার সারথী প্রণববাবুকে সমর্থন করার প্রশ্ন ওঠে না), বরং ভোটের লড়াইটাই তাদের মূল বিবেচ্য বিষয়। আর এই পরস্পর-বিরোধিতার ফাঁক দিয়েই আর একবার সংসদীয় পথের বেরিয়ে পড়েছে!

তবে একটি নতুন ঘটনা হচ্ছে তাঁদের এই নির্লজ্জ দ্বিচারিতার স্বরূপটি এবার এমনকি পার্টির ভেতরকার বামপন্থীমনস্কদের কাছেও স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে। তাই অশোক মিত্রের মতো আদ্যোপান্ত বামপন্থী চেতনার সিপিআই(এম)-ঘনিষ্ঠ মানুষ সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম কাণ্ডের মতো এ ঘটনাতেও পার্টির

এর পর ১০ পৃষ্ঠায়

এপিডিআর-এর চল্লিশ বছরে এক অধিকার-কর্মীর ফিরে দেখা

অমিতদ্যুতি কুমার

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি অধিকার আন্দোলনে তার পথ চলার চল্লিশটি বছর পার হয়ে একচল্লিশে পড়লো। যে সব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে, যে সব প্রবল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে এপিডিআর কাজ করে তাতে চল্লিশটা বছর মাথা উঁচু করে মানবাধিকার, নাগরিক অধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য লড়াইয়ের পতাকাকে উড্ডীন রাখতে পারা এ দেশের পরিস্থিতিতে অবশ্যই গৌরবের বিষয়।

এপিডিআর গড়ে উঠেছিল সাতের দশকের এমন এক সময়ে, যখন পশ্চিমবঙ্গে গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপর নেমে এসেছিল নৃশংসতম আক্রমণ। যখন গণহত্যা, জেলহত্যা, ভুয়া সংঘর্ষ প্রভৃতির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস হিংস্র রূপে আবির্ভূত হয়েছিল, যখন শ্রমজীবী মানুষের গণ আন্দোলনের ওপর ধারাবাহিক নিপীড়ন ছিল নিয়মিত। কপিল ভট্টাচার্য, প্রমোদ সেনগুপ্ত, মৃণাল সেন, উৎপল দত্ত, ডাঃ বিজয় বসু প্রভৃতিদের স্বাক্ষরিত আবেদনকে সামনে রেখে এপিডিআর জন্ম নিয়েছিল '৭২-এর ২৫শে জুন। রাজনৈতিক বন্দীহত্যার বিরুদ্ধে, রাজনৈতিক বন্দীমুক্তি ও বিভিন্ন কালাকানুন বাতিলের দাবিতে এবং গণ আন্দোলনের ওপর রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে, মতপ্রকাশের অধিকারের সপক্ষে এপিডিআর জনমত ও আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। এতে ভীত হয়ে ১৯৭৫-এ কুখ্যাত এমার্জেন্সি জারি হবার সঙ্গে সঙ্গেই এপিডিআর-কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়, সংগঠনের প্রকাশনা 'ভারতীয় গণতন্ত্রের স্বরূপ' বাজেয়াপ্ত হয়, বেশ কয়েকজন সংগঠক গ্রেপ্তার হন।

১৯৭৭-এ এমার্জেন্সি প্রত্যাহার হবার পর সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে উত্তাল আন্দোলনের চাপে পশ্চিমবঙ্গের নব-নির্বাচিত বামফ্রন্ট সরকার সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেওয়ার নীতিগত সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হন। এপিডিআর এর ওপর নিষেধাজ্ঞাও বাতিল হয়। রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটলেও পুলিশি-দমন-পীড়ন, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও গণ আন্দোলনের ওপর আক্রমণ যে অব্যাহত থাকবেই, এই সঠিক উপলব্ধির ভিত্তিতে পুনরুজ্জীবিত হয় এপিডিআর। তার পর থেকে ছেদহীন ভাবে এপিডিআর অধিকারের দাবি আদায়, অধিকার রক্ষা ও সম্প্রসারণের কাজে সতর্ক প্রহরার কাজ করে এসেছে।

সমিতির এই সুদীর্ঘ পথচলার ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলির একটি সার সংকলন দুরূহ— কোনগুলি বেশি গুরুত্বপূর্ণ, তা নিয়ে ভিন্নমতের অবকাশ থাকবেই। পিছন ফিরে তাকালে এক নজরে দেখা যায়— অধিকার আন্দোলনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার ক্ষেত্রও বিস্তৃত হয়েছে। রাজনৈতিক বন্দীদের নিঃশর্ত মুক্তি, মতপ্রকাশের অধিকার, পুলিশি নির্যাতন ও পুলিশি হেফাজতে হত্যার অবসানের দাবির সঙ্গে 'মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রে' বিধৃত অধিকারসমূহ, সুস্থ পরিবেশের অধিকার, নারী ও শিশুদের অধিকার সহ আরো অনেক বিষয় এপিডিআর-এর আন্দোলন ও চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে। ভারতে বিশ্বব্যাঙ্ক, আইএমএফ নির্দেশিত নয়া উদারনৈতিক নীতির প্রয়োগে মানুষের জীবন ও জীবিকার অধিকার, জল-জমি-জঙ্গলের অধিকারের উপর যে হিংস্র আক্রমণ নেমে এসেছে তার বিরুদ্ধে মানুষের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধও তীব্র হয়েছে। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম সহ এ সব প্রতিবাদী আন্দোলনের পাশে এপিডিআর সাধ্যমতো থেকেছে। দেশের খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদ যাতে সাম্রাজ্যবাদীরা কর্পোরেট শিল্পগোষ্ঠীরা অবাধে লুঠে নিতে পারে, কর্পোরেট পুঁজির চলাচল যাতে অবাধ হয় তার জন্য যে কোনো প্রতিবাদী আন্দোলনকে সন্ত্রাসবাদী বা মাওবাদী লেবেল দিয়ে দমনের বিরুদ্ধে এপিডিআর ধারাবাহিকভাবে প্রতিবাদ করে এসেছে। মধ্যভারতের রাজ্যগুলিতে কর্পোরেট লুঠের স্বার্থে গ্রীন হাণ্ট নামের সামরিক অভিযান, জঙ্গল মহলের মানুষের ন্যায্য দাবিদাওয়া ও আত্মমর্যাদার দাবিকে দমন করার জন্য যৌথ বাহিনীর অভিযানের বিরোধিতায় সমিতি দৃঢ়ভাবে অধিকারের দাবির সপক্ষে জনমত গঠনের কাজ করে এসেছে। বিগত নির্বাচনে রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকারের ৩৪ বছরের অপশাসনের অবসানের পর নতুন তৃণমূল-কংগ্রেস জোট সরকার নির্বাচন-পূর্ব প্রতিশ্রুতি ও গণতান্ত্রিক মানুষের প্রত্যাশা ধূলিস্যাৎ করে নিঃশর্তভাবে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তির দাবিকে নীতিগতভাবে স্বীকার করতে এবং জঙ্গলমহল থেকে যৌথবাহিনী প্রত্যাহার করতে অস্বীকার করলো। বরং তারা অধিকার ও বন্দীমুক্তি আন্দোলনে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থকদের সাহায্যে বিভেদ ও বিভ্রান্তি ঘটানোর অপপ্রয়াসে লিপ্ত হল। এ রকম কঠিন সময়েও এপিডিআর নিঃশর্তে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি, জঙ্গলমহল থেকে যৌথবাহিনী প্রত্যাহার, ইউএপিএ আইন প্রত্যাহার, সমস্ত ভূয়া সংঘর্ষে হত্যার ঘটনার তদন্তের দাবিতে আন্দোলন অব্যাহত রাখার চেষ্টা চালিয়েছে। নতুন সরকার এ সব দাবিকে অস্বীকার কবার সঙ্গে সঙ্গে গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর সবরকম আক্রমণ আগের সরকারের মতোই চালিয়ে যাচ্ছে— সভা-সমিতি, সংগঠন, প্রতিবাদী আন্দোলন, মতপ্রকাশের অধিকারের উপর নতুন নতুন

আক্রমণ চালিয়ে আসছে। সিদ্ধার্থ রায়, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের পদাঙ্ক অনুসরণ করে নতুন মুখ্যমন্ত্রী এপিডিআর-কে মাওবাদীদের মুখোশ বলতেও কসুর করেননি।

সরকারের না-পসন্দ গণতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক কাজকর্মকে দমন করার জন্য মিসা, টাডা, পোটা, সশস্ত্র বাহিনী বিশেষ ক্ষমতা আইন, ইউএপিএ সহ সমস্ত অগণতান্ত্রিক আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও জনমত সংগঠিত করার কাজ পুরো চল্লিশ বছর ধরেই এপিডিআরকে করে আসতে হয়েছে। গণতান্ত্রিক জনমতের সাহায্যে এ রাজ্যের বিগত বামফ্রন্ট সরকারের *পোকা* নামের কালাকানুন চালু করার অপচেষ্টা রুখে দিতে পারা এপিডিআর-এর একটি সাফল্য। মৃত্যুদণ্ড প্রথা বাতিলের দাবিতে জনমতের একটি উল্লেখযোগ্য অংশকে এপিডিআর সমবেত করতে পেরেছে।

সারা পৃথিবীতে খনিজ তেল সহ প্রাকৃতিক সম্পদের উপর দখলদারি চালানোর জন্যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তথাকথিত সন্ত্রাসবিরোধী লড়াইয়ের নামে ইরাক-আফগানিস্তান সহ বিভিন্ন দেশে যে আগ্রাসন চালিয়েছে তার বিরুদ্ধেও প্রতিবাদে সরব হয়েছে এপিডিআর। পরমাণু চুল্লি ও পারমাণবিক অস্ত্রের বিরোধিতা, কৃষি ও পশুপালনে জিনপ্রযুক্তি, দেশের কৃষিব্যবস্থা ও খুচরো ব্যবসাকে কর্পোরেটদের হাতে তুলে দেওয়া সহ আরো বহু বিষয়েই অধিকারের দাবিকে সোচ্চার করতে এপিডিআর সাধ্যমত চেষ্টা চালিয়েছে।

কোন কোন ক্ষেত্রে সিপিআই (মাওবাদী) সহ সশস্ত্র রাজনৈতিক আন্দোলনগুলি কর্তৃক সশস্ত্র সংঘর্ষের সময়ও সমস্ত পক্ষের পালনীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানবাধিকার সংক্রান্ত ধারণাগুলির পরিপন্থী কার্যকলাপ ঘটানো ও মানবাধিকারের অযৌক্তিক, নির্বিচার ও পরিহারযোগ্য অবমাননা ঘটানোর বিরোধিতাও এপিডিআর করে এসেছে।

কোনো নির্দিষ্ট সময়ে, কোনো নির্দিষ্ট শাখায় বা কেন্দ্রীয় ভাবেও অধিকারের কোন্ দাবি আন্দোলন ও চর্চার বিষয় হবে তা সেই সময়ের উপলব্ধি ও প্রয়োজনের উপর নির্ভর করলেও এপিডিআর-এর কাজের অভিমুখ নিবদ্ধ রয়েছে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে।

অধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় এপিডিআর-এর তৎপর ও সাহসী তথ্যানুসন্ধান সরকারী ভাষ্যকে সঠিক তথ্য দিয়ে চ্যালেঞ্জ করেছে। শুধু এ রাজ্যে নয় সহযোগী অধিকার সংগঠনগুলির সঙ্গে যৌথভাবে এ রকম তথ্যানুসন্ধান কাশ্মীর থেকে মণিপুর— ঝাড়খণ্ড, অন্ধ্র, গুজরাত, ছত্তিশগড়, ওড়িশা, বিহার সহ বিভিন্ন রাজ্য থেকেই অধিকার হরণের সত্যগুলিকে উদঘাটন করেছে জনসমক্ষে। দেশের অধিকার আন্দোলনগুলির সঙ্গে সমন্বয়ও গড়ে উঠেছে কাজ ও আদর্শগত আলোচনার ভিত্তিতে।

বিভিন্ন বিষয়ে এপিডিআর-এর প্রকাশনাগুলি ও তার মুখপত্র 'অধিকার' আন্দোলনকে সমৃদ্ধ করেছে, জনমত গঠনে সাহায্য করেছে, নাগরিক সমাজকে প্রাণবন্ত বিতর্ক মথিত করেছে। জনবিরোধী আইন থেকে আইনে প্রাপ্য অধিকার, গুজরাত দাঙ্গা থেকে কাশ্মীরের মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের লড়াই, সিঙ্গুরে জমি অধিগ্রহণ থেকে নন্দীগ্রাম গণহত্যা, সোনাই নদীর হারিয়ে যাওয়া থেকে মাথায় মল বহন করতে বাধ্য করার অমানবিকতা, অনাহারে মৃত্যু থেকে শিলিগুড়ির বন্ধ চা বাগানের শ্রমিকদের দুর্দশা, মৃত্যুদণ্ড থেকে নোনাডাঙ্গায় বস্তি উচ্ছেদ, নির্বাচনপ্রার্থীদের কাছে জিজ্ঞাসা থেকে না-ভোটের অধিকার, এ রকম বহু বিষয়ে এপিডিআর ও তার শাখাগুলি স্বল্পমূল্যের পুস্তিকা প্রকাশ করে আর তা নিয়ে কলকাতা সহ বিভিন্ন বই মেলায় অংশগ্রহণ করে।

তার চলার পথে অধিকার আন্দোলনের তত্ত্ব ও সংগ্রামের পথ নির্মাণ করেছে এপিডিআর, সাথে সাথে অধিকার সচেতন কর্মীদলও তৈরি হয়েছে কাজের ও অনুশীলনের মধ্য দিয়ে। মতবিনিময় ও বিতর্কের আবহে গড়ে ওঠা এই কর্মীদলের একটা উল্লেখযোগ্য অংশকে এপিডিআর নিজের সংগঠনে ধরে রাখতে পারেনি এটাও বাস্তব। বিতর্কের সুস্থ আবহ ও বহুস্বরত্বকে ধারণ করার ক্ষেত্রে সমস্যা যে রয়েছে তা অনস্বীকার্য— কারণ এঁদের অনেকেই এখনো এপিডিআর-এর বাইরে অধিকার আন্দোলনের বিভিন্ন মঞ্চে গুরুত্বপূর্ণ সংগঠকের দায়িত্ব পালন করছেন।

একচল্লিশতমবর্ষে পা ফেলার মুহূর্তে এপিডিআর দাঁড়িয়ে এক যুগসন্ধিক্ষণে। সরকারে যে দলই ক্ষমতায় থাকুক, নির্মোহভাবে অধিকারের দাবিগুলিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার, যুক্তি, আন্দোলন আর নৈতিক দৃঢ়তার সমন্বয়ে সমস্ত অধিকার বিরোধী শক্তিকে অধিকারের দাবিগুলি মানতে বাধ্য করার মতো সাধ্যমতো লড়াই এপিডিআরকে চালাতেই হবে— এটাই সময়ের দাবি।

সিপিআই(এম)-এর ঝুলি থেকে ...

৮ পৃষ্ঠার পর

মতাদর্শগত বিচ্যুতিকে ধিক্কার দিয়েছেন ও ব্যঙ্গ করেছেন। আর পার্টির এক তরুণ সর্বভারতীয় ছাত্রনেতা ও উদীয়মান তাত্ত্বিক প্রসেনজিৎ সেন পার্টির এই দ্বিচারিতার ও মতাদর্শগত বিচ্যুতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে পার্টি থেকে পদত্যাগ করতেও দ্বিধা করেন নি। ফলে 'নিয়মমতো' তাঁকে বহিষ্কার করাও হয়েছে। শুধু তিনিই নন, দিল্লীর জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্টি-ইউনিট ও এসএফআই শাখার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যরাও পদত্যাগ করেছেন এবং যথারীতি বহিষ্কৃত হয়েছেন।

এতদিনে কি তাহলে সিপিআই(এম) দলটির মধ্যে এখনও পর্যন্ত থেকে-যাওয়া বামপন্থীদের ঘুম ভাঙছে? আমরা সেদিকে দৃষ্টি রাখবো।

পত্র পত্রিকা থেকে

তারপর সে মরে গেল...

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের হাস্যকর বিশৃঙ্খলা

অশোক মিত্র

এর চেয়ে উদ্ভট আর কিছু হয় না। কিন্তু সৃষ্টিছাড়া অদ্ভুত এই দেশে আর কী আশা করতে পারেন? এ দেশের রাজনৈতিক ভূগোলের দিকে তাকিয়ে দেখুন। পঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, বিহার, সিকিম, পশ্চিমবঙ্গ, মেঘালয়, ত্রিপুরা, ওড়িশা, তামিলনাড়ু, পুদুচ্চেরি, কর্নাটক, গোয়া, গুজরাট— এ সমস্ত রাজ্যের প্রশাসনে কংগ্রেসের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। জম্মু ও কাশ্মীরে ন্যাশনাল কনফারেন্স সরকারের ছোট শরিক তারা। মহারাষ্ট্রে মুখ্যমন্ত্রী তাদের দলের, ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেসের সাথে যৌথভাবে তারা সেখানে ক্ষমতায়। আদর্শ অ্যাপার্টমেন্টের লজ্জাজনক ঘটনায় (স্ক্যান্ডাল) পরপর তিনজন কংগ্রেস মুখ্যমন্ত্রীর নাম জড়িত। সে রাজ্যে তাই এই পার্টির সুনাম একেবারে তলানিতে।

অন্ধ্রপ্রদেশেও এখন কংগ্রেসের মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দিন অবশ্য ফুরিয়ে এসেছে। সে রাজ্যে যে নেতার নেতৃত্বে তেলেগু দেশমকে তাড়িয়ে কংগ্রেস ক্ষমতায় আসে, তিনি মুখ্যমন্ত্রী হন ও রাজ্যে কংগ্রেস সংগঠনকে খানিকটা মজবুত করতে সক্ষম হন, নিজের জন্য তিনি নানান সন্দেহজনক ডিলের মাধ্যমে মাত্র কয়েক হাজার কোটি টাকা কামিয়ে নিয়েছেন। পার্টি সে নিয়ে টুঁ শব্দটিও করে নি। তিনি হেলিকপ্টার ভেঙ্গে পড়ে মারা গেলেন। তাঁর পুত্র বাবার উত্তরাধিকারী হিসেবে মুখ্যমন্ত্রীর গদি দাবি করলেন। তার যুক্তিতে ফাঁক নেই। ইন্দিরা গান্ধী নিহত হওয়ার পর যদি রাজীব গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন, রাজীবের ছেলে এখন গদি পাওয়ার জন্য বিবেচ্য হতে পারেন, তাহলে অন্ধপ্রদেশে তা করলে ভুল কোথায়? নয়াদিল্লীর ম্যাডাম যিনি কংগ্রেসের সব বড় বড় সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন, তিনি এই ছেলের দাবি নাকচ করে দিলেন। সে তখন বিদ্রোহের পথ ধরল। তাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য তার পেছনে সিআইবি লাগানো হলো। তাকে গ্রেপ্তার করা হলো, তার পিতার সাম্রাজ্য বাড়ানোর অপরাধে তাকে অভিযুক্ত করা হলো। অন্ধ্রবাসীর এটা পছন্দ হয় নি। রাজ্যে সাম্প্রতিক উপনির্বাচনে তারা কংগ্রেসকে পথে বসিয়ে দিয়েছে, আর ঐ যুবককে হিরো বানিয়েছে।

আরো এগোনো যাক। উত্তরাখণ্ডে কংগ্রেস প্রশাসনের মাথায়। কিন্তু সেটা সম্ভব হয়েছে কয়েকজন দলহীন বিধায়কের সাহায্যে। অবস্থাটা খুবই ভঙ্গুর ধরনের। রাজস্থান ও হরিয়ানায় কংগ্রেস শাসন খানিকটা স্থিতিশীল অবস্থায় আছে। তাহলেও, সর্বত্র দুর্নীতি ও মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে ক্রোধ যেরকম ধূমায়িত হচ্ছে, তাতে অদূর ভবিষ্যতে কী হবে বলা কঠিন, বিশেষ করে সে রাজ্যে যেখানে বেশ কয়েকজন কংগ্রেসি মন্ত্রীর বিরুদ্ধে কদর্য সব আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ, আরও খারাপ ধরনের সব অভিযোগ উঠেছে। দিল্লীতে পার্টি রাজ্য প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ করছে ঠিকই, কিন্তু সাম্প্রতিক পৌর নির্বাচনে পার্টি বেশ খারাপ করেছে। পূর্বের দিকে তাকান। আসামে মুখ্যমন্ত্রী কংগ্রেস দলের। কিন্তু বিচ্ছিন্নতাবাদের দীর্ঘস্থায়ী সমস্যায় তিনি জর্জরিত। আর মণিপুর, অরুণাচল প্রদেশ, নাগাল্যান্ড বা মিজোরামে সরকারের রং কী তার কোনো প্রাসঙ্গিকতা নেই, সেখানে প্রশাসন চলে আর্মড ফোর্সেস (স্পেশ্যাল পাওয়ার্স) অ্যাক্ট দিয়ে।

এক কথায়, দেশের তিন-চতুর্থাংশে রাজ্য সরকারগুলির কেন্দ্রের শাসক দলের প্রতি কোনো আনুগত্য নেই। তাই সম্প্রতি নয়া দিল্লীর কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউএপিএ রাজত্বের অবস্থা কিছুটা সংকটজনক হয়ে পড়েছে। প্রধানমন্ত্রী নিজেই স্বীকার করেছেন যে সরকারের ওপর তাঁর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই, ধরে নেওয়া যেতে পারে কোয়ালিশন শাসনের কারণে এটা ঘটছে। লাইসেন্স-রাজ আর নেই। কিন্তু তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস বা টেলিকমিউনিকেশন স্পেকট্রাম বিশেষ সুবিধা দেওয়ার নতুন অবিশ্বাস্য সুযোগ করে দিয়েছে, যাতে মাথা ঘুরিয়ে দেওয়ার মতো ব্যক্তিগত সম্পদ তৈরি হচ্ছে। শাসকদলের রাজনৈতিক নেতাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগের অন্ত নেই। আর অন্যদিকে মূল্যবৃদ্ধির বিরাম নেই। কর্তৃপক্ষ নিজেরাই দাম বাড়াচ্ছেন, দাম বাড়ানোয় সহায়তা করছেন। জাতীয় সুরক্ষার নামে জলের মতো টাকা খরচ হয়ে চলেছে। অথচ সবার জন্য রেশন দেওয়ার জন্য টাকা নেই। আমাদের অর্থমন্ত্রী কয়েক দিন আগেও দেশবাসীকে দুশ্চিন্তা করতে বারণ করছিলেন, বলছিলেন বিশ্বের অন্যত্র যাই হোক, আমাদের দুশ্চিন্তার কারণ নেই, আমাদের 'ফান্ডামেন্টালস' শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের দেশের জাতীয় উৎপাদন ৯-১০ শতাংশ হারে বাড়তে চলেছে, দেশের বিদেশি মুদ্রা ভাণ্ডার উপচে পড়ছে। ভয় ছাড়া আমাদের ভয় করার কিছু নেই। বর্তমান বাস্তব অবস্থা কিন্তু অন্য কথা বলছে। দেশে শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধির হার শূন্যের কাছে পৌঁছে গেছে, জিডিপি বৃদ্ধির হার খুব কমে গেছে। সেই একই অর্থমন্ত্রী এখন বলছেন: এখনো সব শেষ হয়ে যায় নি। বৃষ্টি যদি ভালো হয় আর তেলের আন্তর্জাতিক দাম যদি কমে যায়, তবে আমরা বেঁচে যেতেও পারি। আন্তর্জাতিক রেটিং সংস্থাগুলি অবশ্য অর্থমন্ত্রীর এসব আবোলতাবোল বকুনিতে কান দিচ্ছে না, তারা নিজেদের মতো করে মূল্যায়ন করছে। বিশ্ব জুড়ে লগ্নি

পুঁজির চলাচল যারা নিয়ন্ত্রণ করে তারাও তাই করছে। তারা ভারতীয় টাকার উপর অনাস্থা জ্ঞাপন করেছে, এবং দালাল স্ট্রীট থেকে তারা সরে যাচ্ছে। ইংরাজি ছড়ায় যেমন লন্ডন ব্রিজ পড়ার কথা আছে, বিদেশে টাকার দামও তেমন পড়তেই থাকছে।

জরাজীর্ণ একটি দল পরিচালিত একটা দেউলিয়া সরকার। তাতে কী? প্রধানমন্ত্রীর পাশাপাশি যে অর্থমন্ত্রী এই ভয়ানক ঘটনাবলী ঘটার সময় ক্ষমতায় ছিলেন, তিনিই এখন আগামী রাষ্ট্রপতি হিসেবে কংগ্রেস দলের মনোনীত। সবাই, প্রায় সবাই, তাঁর মনোনয়ন সমর্থন করতে উঠেপড়ে লেগেছে। দৌড়, দৌড়, দৌড়। এমনকি প্রধান বিরোধী জোটের গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশও এই কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থীকে সমর্থন করছেন। উত্তরপ্রদেশে— যেখানে কংগ্রেস একসময় ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী, আর এখন মোটেই পাত্তা পায় না— সেখানে গত পাঁচ বছরের শাসক দল বহুজন সমাজ পার্টি আর তাদের হটিয়ে এখন ক্ষমতায় এসেছে যে সমাজবাদী পার্টি, দুই দলই এমন এক দলের প্রার্থীকে সমর্থন করার প্রতিযোগিতায় নেমেছে, উত্তরপ্রদেশে যে দলের উপস্থিতি অকিঞ্চিৎকর। সংবাদমাধ্যম উচ্ছ্বসিত— আগামী রাষ্ট্রপতি কে হবেন সে নিয়ে ঐকমত্য তৈরি হওয়ায়। মতাদর্শের অবশ্য অনেক দিন আগেই মৃত্যু ঘটেছে। নীতির ব্যাপারটাও এখন পাত্তা পায় না। কে কেমনভাবে ঘুঁটি সাজাবে, হিসেবনিকেশ করবে, সেটাই শুধু গুরুত্বপূর্ণ। কোনো কোনো নেতার ক্ষেত্রে অবশ্য সিবিআই-এর কেস নিয়ে কোনো বোঝাপড়া বা সিবিআই কেস যাতে না হয় সে নিয়ে কোনো বোঝাপড়া পেছনে আছে। কারো কারো ক্ষেত্রে হিসেবটা আর একটু দূরদৃষ্টি নিয়ে করা। ২০১৪ সালে লোকসভা নির্বাচনে যদি কোনো পার্টি পরিষ্কারভাবে জয়ী না হয় তবে রাষ্ট্রপতি যাকে প্রথম ডাকবেন সে সুবিধাজনক অবস্থান পেয়ে যাবে, তাই সেই ব্যক্তিটির সঙ্গে আগাম একটা সম্পর্ক গড়ে রাখা ভালো।

এই হলো অবস্থা। রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হয়ে দাঁড়িয়েছে বেটিং বাজার। বাজির হার বেশ উঁচু, আর বাজারের গুজবে যদি বিশ্বাস করা যায়, টাকার কোনো লেখাজোখা নেই। এরকম এক হাস্যকর ধরনের উদ্ভট অবস্থায় এমন কিছু বিশেষ ঘটনা ঘটছে যা মন্তব্য দাবি করে। প্রথম হলো, এই নির্বাচন অন্য জাতীয় দল ভারতীয় জনতা পার্টির ক্ষেত্রে কীরকম সংকট এনেছে। তাদের কাছে নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করাটা প্রধান নয়, এই ঘটনাটিকে ব্যবহার করে আগামী দুবছর পরের লোকসভা নির্বাচনে পার্টির নেতৃত্বে কে থাকবেন সেটা স্থির করাই প্রধান। এই প্রক্রিয়ায় ধর্মীয় মৌলবাদের চাকচিক্য একটু ম্লান হয়েছে। সেটা অবশ্য সুখের কথা। আর দ্বিতীয় মজার ঘটনাটি এক মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর— কোন্ রাজ্যের কথা বলছি বুঝতেই পারছেন। তাঁর অতিরিক্ত উচ্চাশার কারণে তিনি বিপদে পড়েছেন। একা রামে রক্ষা নেই, সুগ্রীব দোসর। হাইকোর্টের একটা রায়ও তাঁর বিরুদ্ধে গেছে। পর পর বেশ কিছু সাফল্যের পর, তিনি এখন বড় বড় পরাজয়ের মুখোমুখি। জল যেদিকে যায়, নোংরা জলও সেদিকে যায়।

তবে সবচেয়ে অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে বামেদের ক্ষেত্রে, এতদিন পর্যন্ত যাদের নীতিনিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা মনে করা হতো। বামেদের প্রধান দলটি ঠিক করেছে যে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থীকে সমর্থন না করে উপায় নেই— সেই প্রার্থীটি যদি এদেশে নয়া উদারনীতির প্রধান রূপকারদের একজন হিসাবে এদেশকে আজকের ভয়ানক অবস্থায় নিয়ে আসেন, শ্রমিক শ্রেণীকে দুর্ভোগে ফেলে থাকেন, তা হলেও নয়। এই সিদ্ধান্তের কারণ হিসাবে তারা দুটি বিষয়ের কথা বলেছেন। প্রথমত, কংগ্রেস প্রার্থীর পক্ষে সমর্থন দিন দিন বাড়ছে, আর তারাও সুবোধ বালকের মতো এই সমর্থকের দলে ভিড়তে চান। এর অর্থ তারা সবার সঙ্গেই ভিড়ে যেতে চান, মতাদর্শগত ও নীতিগত যত মৌলিক ফারাকই থাকুক না কেন। দুষ্টজনে বলতে পারে, এর চেয়ে তাদের দলটিকে তুলে দিয়ে মহান জাতীয় ঐকমত্যের দাবিদার কংগ্রেসে মিশে গেলেই কি বেশি সততার পরিচয় দেওয়া হত না? বামপন্থী এই দলটির দ্বিতীয় অজুহাতটি স্থানীয় কোনো দলের উপযুক্ত। সেটি কী তা বলার বদলে একটি উপকথা বলা যাক। এক ছোট্ট দেশের রাজা সময় কাটানোর জন্য নিষ্পাপ কিছু পথ নিতেন। প্রতিদিন সকালে রাজার পেয়াদা গিয়ে রাজধানীর রাস্তা থেকে দুজন ভিখারি ধরে আনত, তাদের হাত পা বেঁধে রাজবাড়ির উঠোনে ফেলত। রাজকীয় অত্যাচার বিভাগের কর্ণধার এবার রাজাকে সেলাম করে চাবুক বের করে ওই দুজনকে চাবকাতে শুরু করত। প্রতিবার ২৫ বার করে চাবুক মারা চলত যতক্ষণ না তাদের প্রাণবায়ু বেরিয়ে যায়। একদিন সকালে ওই ভিখারিদের একজন, চাবুকের মাঝে, যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে কোনোরকমে শেষ শক্তিটুকু দিয়ে বেশ গর্বিত স্বরে অন্য ভিখারিকে বললো, "কী ভাগ্যি আমার, জানিস, রাজার এই যে অত্যাচার বিভাগের কর্ণধার, ও আমারই গ্রামের লোক।" আর তারপর সে মরে গেল।

দি টেলিগ্রাফ, ২৯ জুন ২০১২ (অনুবাদ)

õ±¿í¿æÈBÂ õùþ, ÷±õ¿õßÂ

স্বাস্থের বৃত্তে

স্বাস্থ্য, রোগ, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও সমাজ নিয়ে
আপনার সহমর্মী দ্বিমাসিক বাংলা পত্রিকা

পাঠক এবং এজেন্টদের যোগাযোগ করার ফোন নম্বর
৯৮৩০৯২২১৯৪ বা ৯৩৩১৯১২৫৩৭

বিতর্ক

পুঁজিবাদের সঙ্কট ও মার্কসীয় মূল্য তত্ত্ব

গুরুপ্রসাদ কর

অনীক ২০১০ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর সংখ্যায় অধ্যাপক সুতনু ভট্টাচার্য 'পুঁজিবাদের আগ্রাসী কর্পোরেটতন্ত্র— সীমার মাঝে অসীম স্ফীতির সন্ধান' প্রবন্ধটিতে বর্তমান অবস্থায় পুঁজিবাদের যে ধরনের বিকাশ ঘটেছে তার একটি রূপরেখা হাজির করেছেন। তিনি যথাযথভাবেই মুক্ত প্রতিযোগিতার যুগের (লেখকের ভাষায় শিল্প-যুগের) পুঁজিবাদের সাথে আজকের সাম্রাজ্যবাদী যুগের পুঁজিবাদের গুণগত পার্থক্যকে তুলে ধরেছেন, বর্তমানের কর্পোরেটতন্ত্র, উৎপাদনক্ষেত্র থেকে সম্পূর্ণ বিযুক্ত আর্থিক কারবার ও তার চরম ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকলাপের বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন।

প্রবন্ধটি পড়ে আমার মনে হয়েছে যে যদিও তিনি একচেটিয়া ব্যবস্থা ও বর্তমান পর্যায়ে তার ধ্বংসাত্মক আর্থিক ক্রিয়াকলাপের বিবরণ হাজির করেছেন, কিন্তু মার্কসীয় মূল্য ও উদ্বৃত্ত মূল্যের দৃষ্টিকোণ থেকে তথা পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কের দৃষ্টিকোণ থেকে এই ব্যবস্থার পচনকে হাজির করতে পারেননি। আসলে মূল্য ও উদ্বৃত্ত মূল্য নিয়ে তাঁর বিভ্রান্তির কারণেই এটা ঘটেছে। যেমন প্রবন্ধটির এক জায়গায় তিনি বলেছেন, "উৎপাদিত পণ্যের বিনিময় মূল্য নির্ধারণের শ্রমের তত্ত্বটি (লেবার থিওরি অফ ভ্যালু) নির্ভর করে শিল্প পুঁজিবাদের ব্যাখ্যায় কার্ল মার্কসের (১৮১৮-৮৩) উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্বটির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কিন্তু একথা স্বীকার করাই ভাল যে এই তত্ত্বটি শুধুমাত্র শিল্প-পুঁজিবাদের শোষণ প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যাতেই সীমাবদ্ধ। পুঁজিবাদের অন্য পর্যায়গুলির ব্যাখ্যা এই তত্ত্বের সাহায্যে করা যায় না।..."

আসলে এই প্রবন্ধে লেখক পুঁজিবাদের আজকের বিকাশ ও পুঁজিবাদের অন্তর্বস্তুর সাথে তার আন্তঃসম্পর্ককে হিসাবের মধ্যে আনেননি। পুঁজিবাদ নানা পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে গেলেও শেষবিচারে সেটা পুঁজিবাদই। তাই পুঁজিবাদের এমন কোন একটি বা কয়েকটি মর্মবস্তু আছে পর্যায় বদলালেও যার বদল ঘটে না। কী সেই মর্মবস্তু? সেই মর্মবস্তু হল যে পুঁজি হচ্ছে শেষবিচারে একটি নির্দিষ্ট ধরনের সামাজিক উৎপাদন সম্পর্ক, যে সম্পর্কের প্রকাশ ঘটে মূল্য ও উদ্বৃত্ত মূল্যের মধ্যে দিয়ে। ব্যাপারটি বোঝার জন্য একটু ব্যাখ্যা করা যাক।

পণ্য বিনিময় ব্যবস্থা মানেই পুঁজিবাদ নয়, পুঁজিবাদ একটি বিশেষ ধরনের পণ্য বিনিময় ব্যবস্থা। মার্কসের মতে পণ্য বিনিময় ব্যবস্থায় উৎপাদকদের মধ্যে যে সামাজিক সম্পর্ক তৈরি হয় সেটাই হল মূল্য। মূল্য উৎপাদিত বস্তুগুলির কোন অন্তর্নিহিত গুণ নয়, কেবল পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থাতেই এই গুণের উদ্ভব ঘটে। সরল পণ্য বিনিময় ব্যবস্থায় (যেখানে উৎপাদকরাই উৎপাদন উপায়ের মালিক এবং তারাই পণ্যের বিক্রেতা) মূল্যের সরাসরি প্রকাশ ঘটে পণ্যগুলির বিনিময় মূল্যের মধ্যে দিয়ে; সেখানে পণ্যের মূল্য ঠিক হয় সেটা তৈরি করতে যে পরিমাণ সামাজিক বিমূর্ত শ্রম প্রয়োজন হয় তার পরিমাণ দিয়ে। কেউ যদি প্রশ্ন করেন যে কীভাবে প্রমাণ হল যে পণ্যের বিনিময়মূল্য তার মূল্যের সমান হয়, তা হলে তার উত্তরে বলা যায় যে, যে সমাজে উৎপাদকরা স্বাধীনভাবে উৎপাদন চালায় ও পণ্য বিনিময় করে সেখানে এরকমটা হলেই বিভিন্ন ভোগ্যদ্রব্যগুলি সমাজের সদস্যদের প্রয়োজন অনুযায়ী তৈরি হতে পারে এবং এইভাবে সমাজটি টিকে থাকার আবশ্যিক শর্তটি পালিত হয়। কোন পণ্যের বিনিময়মূল্য যদি তার মূল্যের বেশি হয় তাহলে স্বাধীন পণ্য উৎপাদকরা ঐ পণ্যটি তৈরিতে উৎসাহ দেখাবে আর তার ফলে ওই পণ্যের উৎপাদন একসময় সমাজের চাহিদার তুলনায় বেড়ে যাবে, ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় পণ্যের উৎপাদন কমে যাবে। কিন্তু বাজারের নিয়মেই এরকমটা বেশিদিন চলবে না। কারণ বিনিময় মূল্য মূল্যের চেয়ে বেশি হলে চাহিদার তুলনায় ঐ পণ্যের যোগান বেড়ে যাবে। যার ফলে ঐ পণ্যের বিনিময়মূল্য আবার কমতে থাকবে যতক্ষণ না বিনিময়মূল্য আবার মূল্যের সমান হয়। এইভাবে সরল পণ্যোৎপাদন ব্যবস্থার যেমন সমাজ পুনরুৎপাদনের শর্তটি পালিত হয় তেমনি এই ব্যবস্থায় প্রত্যেকে তার নিজের পণ্যের বিনিময়ে অন্য পণ্য সেই পরিমাণেই অর্জন করতে পারে যা তৈরি করতে মোটামুটি সেই পরিমাণ শ্রমসময় লাগে যা তার নিজের পণ্য তৈরি করতে লেগেছে। তাই সরল পণ্য বিনিময় ব্যবস্থায় কেউ বা কোন শ্রেণী নিয়মিতভাবে অন্যের তৈরি মূল্য আত্মসাৎ করতে পারে না।

পুঁজিবাদ যেহেতু পণ্য বিনিময় ব্যবস্থা তাই মূল্য এখানেও ভূমিকা পালন করে। কিন্তু পুঁজিবাদ সরল পণ্য উৎপাদন নয়, এখানে একটি শ্রেণী উৎপাদন উপায়ের মালিক যাদেরকে আমরা পুঁজিপতিশ্রেণী বলে থাকি, আর যারা প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদন চালায় তাদের উৎপাদন উপায়ের উপর মালিকানা থাকে না, মজুরির বিনিময়ে তারা উৎপাদন চলায়। মার্কস প্রমাণ করেছিলেন যে এই ধরনের সমাজে কেবল মূল্য নয়, মূল্য এবং উদ্বৃত্ত মূল্য এই দুইয়ে মিলে সামাজিক সম্পর্কের ভিত্তি তৈরি করে। উদ্বৃত্ত তৈরি হওয়া যে কোন শ্রেণী সমাজের বৈশিষ্ট্য, কিন্তু উদ্বৃত্ত মানেই উদ্বৃত্তমূল্য নয়, উদ্বৃত্তমূল্য একটি নির্দিষ্ট উৎপাদন সম্পর্কের বৈশিষ্ট্য। এই উদ্বৃত্তমূল্যের প্রকাশ কীভাবে ঘটে? একটি শ্রমিক কারখানায় যে পরিমাণ মূল্য তৈরি করে ও মজুরির মধ্যে দিয়ে সে যে পরিমাণ মূল্য ফেরত পায় তার বিয়োগফলই শ্রমিকটির তৈরি করা উদ্বৃত্ত মূল্য। মার্কস দেখিয়েছিলেন যে, যেখানে সরল পণ্য বিনিময় ব্যবস্থায় কেউ অন্যের তৈরি মূল্য নিয়মিতভাবে আত্মসাৎ করতে পারে না সেখানে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পণ্যগুলির বিনিময় মূল্য সেগুলির

মূল্যের সমান হলেও পুঁজিপতিশ্রেণী নিয়মিতভাবে মুনাফা (বিনিয়োজিত মূল্য ও অর্জিত মূল্যের পার্থক্য) আত্মসাৎ করতে পারে। পণ্য তার মূল্যে বিক্রি হলে একটি পুঁজিপতি ততটাই মুনাফা অর্জন করে যতটা উদ্বৃত্তমূল্য তার সংস্থায় নিয়োজিত শ্রমিকেরা তৈরি করেছে। এবার যদি প্রশ্ন ওঠে যে সমগ্র পুঁজিপতিশ্রেণী কতটা মুনাফা অর্জন করে। সেটা নিশ্চয়ই সমগ্র শ্রমিকশ্রেণী মোট যতটা মূল্য তৈরি করে ও মজুরি হিসাবে যতটা ফেরত পায় তার বিয়োগফল, অর্থাৎ মোট উদ্বৃত্তমূল্য মোট মুনাফার সমান।

সুতনুবাবু লিখছেন, "কিন্তু মুনাফা কেন হয় কীভাবে হয় এ বিষয়ে কোন গ্রহণযোগ্য তত্ত্ব অর্থশাস্ত্রে নেই। একমাত্র মার্কসের উদ্বৃত্তমূল্য তত্ত্বে এর খানিকটা ব্যাখ্যা মেলে। দুর্ভাগ্যের বিষয় মার্কস এই তত্ত্ব নির্মাণ করেছিলেন তার সমসাময়িক ধ্রুপদী বা ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে পণ্যের বিনিময় মূল্যের শ্রম তত্ত্বের (লেবার থিওরি অফ ভ্যালু) মাপকাঠিতে, যার প্রয়োগ শিল্পপুঁজিবাদেই সীমিত। তাহলেও, মার্কস অবহিত ছিলেন উদ্বৃত্ত মূল্যকে আর্থিক মুনাফায় রূপান্তরিত করার সমস্যাটি সম্বন্ধে, যা উল্লিখিত হয়েছে ট্রান্সফরমেশন প্রবলেম নামে।"

সুতনুবাবুর মূল বক্তব্য হলো যে মুনাফার উৎসকে আমরা খুঁজে পাইনি। কিন্তু এই বক্তব্যকেই তিনি পরিচ্ছন্নভাবে না রেখে মার্কসের তত্ত্বে এর আংশিক সমাধান মেলার কথা বলে বিভ্রান্তি তৈরি করেছেন। দেখা যাক তিনি কীভাবে বিভ্রান্তি তৈরি করেছেন। উদ্বৃত্ত মূল্যকে আর্থিক মুনাফায় রূপান্তরিত করার সমস্যা পুঁজিবাদের নিশ্চয়ই একটি সমস্যা, কিন্তু তার সাথে মার্কসের ট্রান্সফরমেশনের কোন সম্পর্ক নেই। উপরন্তু মার্কসের ট্রান্সফরমেশনে মোট মুনাফা মোট উদ্বৃত্ত মূল্যের সমান, তাই মুনাফার উৎস নিয়ে এখানে কোন বিভ্রান্তি নেই। তাহলে ট্রান্সফরমেশন বলতে কী বোঝাচ্ছে? আমরা আগেই বলেছি মার্কস দেখিয়েছিলেন যে পণ্যের বিনিময় মূল্য মূল্যের সমান হলেও পুঁজিপতির মুনাফা হয় এবং সেক্ষেত্রে কোন পুঁজিপতির অর্জিত মুনাফা তার নিজের সংস্থায় তৈরি উদ্বৃত্ত মূল্যের সমান হবে। কিন্তু এমনটা হলে যে উৎপাদনক্ষেত্রগুলিতে মোট নিয়োজিত পুঁজির মধ্যে স্থায়ী পুঁজির অনুপাত বেশি অর্থাৎ শ্রমিকের শ্রমশক্তি কিনতে অপেক্ষাকৃত কম পুঁজি বিনিয়োজিত হয় সেখানে উদ্বৃত্ত মূল্যও কম হবে, ফলে সেই ক্ষেত্রগুলিতে মুনাফার হারও কম হবে। পুঁজিবাদে যেহেতু মুনাফার লক্ষ্যেই উৎপাদন চলে, তাই এটা হলে ঐ ক্ষেত্রগুলিতে মুনাফার হারও কম হবে। পুঁজিবাদে যেহেতু মুনাফার লক্ষ্যেই উৎপাদন চলে, তাই এটা হলে ঐ ক্ষেত্রগুলিতে বিনিয়োগ কমে আসবে। বাস্তবত এমনটা হয় না, পুঁজিবাদের মুক্ত প্রতিযোগিতার যুগে সমস্ত উৎপাদনক্ষেত্র জুড়ে মুনাফার হার একই থাকতে গেলে সমস্ত পণ্যের বিনিময় মূল্য উৎপাদন দামের (প্রাইস অফ প্রোডাকশন) সমান হয়। কোন পণ্যের উৎপাদন দাম বলতে বোঝানো হয় সেটি উৎপাদনে ব্যয়িত পুঁজির মূল্য ও সামাজিক গড় মুনাফা (মোট উদ্বৃত্ত মূল্য ও মোট বিনিয়োজিত পুঁজির অনুপাত)-র যোগফল যেখানে কোন পণ্যের মূল্য বলতে বোঝায় পণ্যটি উৎপাদনে মোট ব্যয়িত মূল্য (ব্যয়িত পুঁজির মূল্য ও উদ্বৃত্তমূল্যের যোগফল)। মার্কসের ট্রান্সফরমেশন বলতে বোঝায় বাজারের প্রতিযোগিতা কীভাবে মূল্যকে উৎপাদন দামে ও উদ্বৃত্তমূল্যকে মুনাফায় রূপান্তরিত করে যেখানে মোট উৎপাদন দাম মোট মূল্যের সমান এবং মোট মুনাফা মোট উদ্বৃত্তমূল্যের সমান। মোট সামাজিক উদ্বৃত্ত মূল্য বিভিন্ন সেক্টরের মধ্যে সেখানে বিনিয়োজিত পুঁজির অনুপাতে ভাগ হয়ে যায়। 'ট্রান্সফরমেশন প্রবলেম' কথাটা আসার পেছনে রয়েছে অন্য ইতিহাস। অনেক অর্থনীতিবিদ মনে করেন যে মার্কস যে মুনাফার হার হিসাব করেছেন তা আসলে মূল্যের উপর ভিত্তি (ভ্যালু রেট অফ প্রফিট) করে যা দৃশ্যমান নয়, যেখানে পুঁজিপতিরা মুনাফার হিসাব করেন বাজার দামের উপর ভিত্তি করে (প্রাইস রেট অফ প্রফিট)। এদুটি যেহেতু আলাদা তাই মার্কস উৎপাদন দাম ও মূল্যের যে সম্পর্ক হাজির করেছেন তাকে শুধরে নেওয়া দরকার। যাইহোক ট্রান্সফরমেশন সংক্রান্ত বিষয়টির সাথে উদ্বৃত্ত মূল্য সত্যি সত্যি অর্থ রূপে মুনাফায় রূপান্তরিত হতে পারবে কিনা সেই সমস্যার কোন সম্পর্ক নেই।

তবে সামাজিক পুঁজি কেবল উৎপাদন ক্ষেত্রেই নিয়োজিত হয় না, তা বাণিজ্য সহ নানা আর্থিক ক্ষেত্রেও নিয়োজিত হয় যেখানে কোন নতুন মূল্য বা উদ্বৃত্ত মূল্য তৈরি হয় না। যেমন ব্যাঙ্কে অর্থ নিয়োজিত হয় যেখানে কোন নতুন মূল্য বা উদ্বৃত্ত মূল্য তৈরি হয় না। যেমন ব্যাঙ্কে অর্থ নিয়ে যতই নাড়া-চাড়া হোক না কেন সেখানে মুনাফা হয় কিন্তু উদ্বৃত্ত মূল্য তৈরি হয় না। তাহলে ব্যাঙ্কের মুনাফার উৎস কী? শ্রমিকের তৈরি করা সেই উদ্বৃত্ত মূল্যেরই একটি অংশ যা ব্যাঙ্কের মালিক সুদ হিসাবে উৎপাদন ক্ষেত্রের মালিকশ্রেণীর কাছ থেকে পেয়ে থাকে। একইভাবে অন্যান্য আর্থিক ও বাণিজ্যক্ষেত্রেও যে মুনাফা হয় তা উৎপাদন ক্ষেত্রে তৈরি হওয়া উদ্বৃত্ত মূল্য থেকে আসে। তাই মার্কসের মূল্য তত্ত্বে মুনাফার উৎস নিয়ে কোন বিভ্রান্তি নেই। খালি তাই নয়, যদি পণ্যের বিনিময় মূল্য মার্কস বর্ণিত উৎপাদন দামের সমান নাও হয় তাতেও মূল্যতত্ত্ব অনুযায়ী মুনাফার একমাত্র উৎস হিসাবে একমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর তৈরি করা উদ্বৃত্ত মূল্যই বিবেচিত হতে পারে। মার্কসের মূল্যতত্ত্ব কেউ গ্রহণ করতেও পারে নাও পারে। কিন্তু গ্রহণ করলে এই তত্ত্বে মুনাফার উৎস নিয়ে ভ্রান্তির কোন স্থান নেই।

উনবিংশ শতকের শেষ দিক থেকে পুঁজিবাদ একচেটিয়া ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হয়। লেনিন বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণ করে এই ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যমূলক দিকগুলি তুলে ধরেন। একচেটিয়া ব্যবস্থায় হাতে গোনা কয়েকটি সংস্থা সমাজের মুনাফাদায়ক ক্ষেত্রগুলিকে কব্জা করে নেয়, ফলে সেখানে আর কেউ বিনিয়োগের সুযোগ পায় না। আর এটা করার জন্য একচেটিয়া পুঁজি যে পদ্ধতি গ্রহণ

করে তা মুক্ত প্রতিযোগিতা নয়, বরং নানাভাবে সরকারি কর্তাব্যক্তি, আমলা, মন্ত্রী, ইউনিয়নের নেতাদের কিনে ফেলে। ফলে একচেটিয়া পুঁজি কাঁচামাল কেনা থেকে শুরু করে পণ্য বিক্রির ক্ষেত্রে নিজের দেশে ও অন্যান্য পশ্চাৎপদ দেশে নানা রকম সুবিধা আদায় করে নেয়। এর ফলে এদের মুনাফার হার আর গড় সামাজিক মুনাফার হারের সমান হয় না, অনেক বেশি হয়। অর্থাৎ একচেটিয়া অবস্থান ও নানা ধরনের অসৎ পদ্ধতি অবলম্বন করে এরা সামাজিক উদ্বৃত্ত মূল্যের সিংহভাগ কব্জা করে নেয় যার ফলে অ-একচেটিয়া পুঁজির মুনাফার হার অনেকটাই কম হয়।

যাইহোক এরপর লেখক বর্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় আর্থিক ক্ষেত্রটির বাড়বাড়ন্ত নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং সেটা করতে গিয়ে সঠিকভাবেই পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় অর্থরূপে মুনাফা অর্জন করবার সমস্যাকে হাজির করেছেন। কিন্তু এর বীজ কীভাবে পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থা এবং বিশেষত পুঁজিবাদী ব্যবস্থার দ্বন্দ্বের মধ্যেই অবস্থান করে তা পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেন নি। আসলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রমিক যে উদ্বৃত্ত মূল্য তৈরি করে তা উৎপাদিত পণ্যের মূল্যে নিহিত থাকে। পুঁজিপতি যেহেতু এই উদ্বৃত্ত মূল্যের সমগ্র বা একটি অংশকে পুনরায় পুঁজি হিসাবে পুরনো ক্ষেত্রে বা নতুন কোন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করতে চায় তাই সে উৎপাদিত পণ্যের বিনিময়ে পুরনো বা নতুন ক্ষেত্রের প্রয়োজনীয় উৎপাদন-উপায়গুলি সংগ্রহ করতে চায়। কিন্তু সমস্যা তখনই হয় যখন তার উৎপাদিত পণ্যগুলির সামাজিক চাহিদা না থাকে। যেহেতু পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সংস্থাগুলি উৎপাদন চালায় স্বাধীনভাবে, সামাজিক চাহিদার হিসাব করে নয়, তাই সামাজিক চাহিদার নিরিখে বিভিন্ন ক্ষেত্রের উৎপাদনের মধ্যে যে আনুপাতিক সম্পর্ক থাকলে সমস্ত পণ্য বিক্রি হতে পারে তা বিঘ্নিত হয়। তাই সবসময় পণ্য অবিক্রিত থেকে যাবার সম্ভবনা থেকে যায়। আর এর অর্থই হল মুনাফাকে অর্থরূপে অর্জন করার সমস্যা। মনে রাখা দরকার যে অর্থের অস্তিত্বের জন্য এই সমস্যার উদ্ভব হয় নি। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সামাজিক উৎপাদন ও ব্যক্তিমালিকানার দ্বন্দ্বই এই সমস্যার বস্তুগত উৎস এবং পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করেই এর থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

পুঁজিবাদের আর একটি মৌলিক সমস্যার দিকে আমরা এবার নজর দিই। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পুঁজির সঞ্চয় যে পরিমাণে বাড়তে থাকে সেই পরিমাণে পুঁজির বিনিয়োগও বাড়তে থাকে। কিন্তু পুঁজির এই বিনিয়োগ স্থির পুঁজি ও চল পুঁজিতে একই হারে ঘটে না, স্থির পুঁজির বিনিয়োগের হার অপেক্ষাকৃত বেশি থাকে। উদ্বৃত্ত মূল্য যেহেতু চল পুঁজির উপর নির্ভর করে, তাই পুঁজির বিনিয়োগ যে হারে বাড়ে সেই হারে উদ্বৃত্ত মূল্য বাড়ে না, যার নীট ফল হল মুনাফার হার কমে যাওয়া। অপরদিকে চল পুঁজির বিনিয়োগ কম হওয়াতে শ্রমজীবী মানুষের ক্রয়শক্তি কমে গিয়ে চাহিদার তুলনায় পণ্যের যোগান বাড়তে থাকে, ঘটে অতি-উৎপাদন ও এইভাবে বিনিয়োগের সুযোগ কমে আসে। অনুন্নত দেশে বিনিয়োগ করে এর কিছুটা সমাধান হয় বটে, কিন্তু সময়ের সাথে পুঁজি যে হারে বাড়ে, লাভজনকভাবে উৎপাদন ক্ষেত্রে পুঁজির বিনিয়োগ সেই হারে বাড়তে পারে না। বর্তমানের পুঁজিবাদ এইরকম একটি অবস্থায় রয়েছে।

এর ফলে সত্যিকারের উৎপাদন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ না করে অর্থপুঁজিকে আবার আর্থিক ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করেই মুনাফা অর্জনের প্রবণতা বাড়ছে এবং বর্তমান পর্যায়ে এই প্রবণতা সাংঘাতিক গতি অর্জন করেছে যার চিত্র সঠিকভাবেই তুলে ধরেছেন সুতনুবাবু। ঋণ নির্ভর এইরকম একটি অর্থনীতিতে উৎপাদন ক্ষেত্রে তৈরি হওয়া উদ্বৃত্তমূল্যকে পৃথিবী জুড়ে ফাটকা বাজারে ঘোরানো হতে থাকে এবং খাতায় কলমে বিনিয়োগকারীদের মুনাফা বাড়তেই থাকে। মনে হতে থাকে যে অর্থ নিজেই নিজের বৃদ্ধি ঘটাতে পারে, তার জন্য পণ্য উৎপাদন ও তার বিক্রির ঝঞ্ঝাট পোয়ানো আবশ্যিক নয়। যেন মুনাফার উৎস কেবল উদ্বৃত্ত মূল্য নয়, তার আরোও কোন উৎস আছে। সুতনুবাবু বলেছেন, ''মুনাফা হচ্ছে কী করে তার ব্যাখ্যা মিলছে না।'' প্রশ্নটাকে উলটে দিয়ে যদি বলা যায় বাজার থেকে মুনাফা (বা পুঁজি) কীভাবে উবে যায় তার ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে কী? আর্থিক ব্যবস্থাকে যারা নিয়ন্ত্রণ করে তারা নিশ্চয়ই উদ্বৃত্তমূল্যেরও সিংহভাগ হাতিয়ে নেয়, কিন্তু আর্থিক সংস্থাগুলির অর্জিত মোট মুনাফার পরিমাণের সাথে যদি মোট সামাজিক উদ্বৃত্ত মূল্যের পরিমাণের সঙ্গতি না থাকে, তাহলে একটি পর্যায়ে বাস্তবতা বিদ্রোহ করে তার জানান দেয়। সাম্প্রতিককালে আমরা এর জলজ্যান্ত উদাহরণ দেখলাম। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশাল বিশাল বিশাল ব্যাঙ্ক ও বিমা কোম্পানি যারা কিনা মুনাফার পাহাড় জমিয়ে ফেলেছিল, দেখা গেল তারা সব দেউলিয়া হয়ে গেছে, অর্থাৎ তাদের বিপুল মুনাফার অস্তিত্ব ছিল কাগজ কলমেই, উদ্বৃত্তমূল্য হিসাবে তার অস্তিত্ব ছিল না। মার্কস মূল্য ও উদ্বৃত্ত মূল্যকে সেভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন তাতে শেয়ার মার্কেট ধ্বস নামলে মূল্য বা উদ্বৃত্ত মূল্য উবে যায় না। খাতায় কলমে অর্জিত মুনাফা যদি তার উৎসকে ছাড়িয়ে যায় তাহলে কোন একটি পর্যায়ে মুনাফার একটি অংশ বাজার থেকে উবে যেতে বাধ্য। আর ঠিক সেটাই ঘটে থাকে এবং বর্তমান পর্যায়েও সেটাই ঘটছে।

পরিশেষে সুতনুবাবু সঠিকভাবেই বলেছেন যে পুঁজিবাদের ধ্বংসাত্মক প্রবণতাগুলি যদি আইন করে রোধ করা যেত তাহলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটাই আর পুঁজিবাদী থাকে না। এর অর্থ হল পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মৌলিক দ্বন্দ্বগুলি পুঁজিবাদীকে বারবার উৎপাদন শক্তির ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবেই, এই পরিণতি থেকে পুঁজিবাদ কিছুতেই মুক্ত হতে পারে না। ঐতিহাসিভাবে পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্নভাবে কোন আর্থব্যবস্থার অস্তিত্ব কোনকালে ছিল না। মূল্য সম্পর্কের উপর দাঁড়িয়েই মুদ্রা তথা আর্থব্যবস্থার উদ্ভব ঘটে। পণ্য উৎপাদন বিকাশের হাত ধরেই এসেছে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ও তার আর্থিক কার্যকলাপ। আর সেই

পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বিকশিত হয়েই এসেছে আজকের সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা তথা ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদ। মার্কসীয় মতে, প্রলেতারীয় একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করে মানুষের মধ্যে গড়ে ওঠা মূল্য ও উদ্বৃত্তমূল্যের এই সম্পর্ক এবং শেষত পণ্য উৎপাদনকে ক্রমিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ধ্বংস করেই নতুন সাম্যবাদী সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব। আর তার ফলে নতুন আর্থব্যবস্থা গড়ে তোলা নয়, পুঁজিবাদী উত্তর সমাজব্যবস্থায় গোটা আর্থব্যবস্থারই স্থান হবে একমাত্র যাদুঘরে।

লেখকের মন্তব্য

যে কোনও লেখকই তার লেখা নিয়ে আর কেউ আলোচনা করলে উৎসাহিত হয়, তা সে যতই বিরূপ মন্তব্য বা কঠোর সমালোচনা হোক না কেন। গুরুপ্রসাদবাবু প্রবন্ধটিকে গুরুত্ব দিয়ে বিস্তৃত আলোচনার যোগ্য মনে করেছেন, এতেই আমি লেখক হিসাবে কৃতজ্ঞ। ''পুঁজিবাদের অন্তর্বস্তু'' হিসাবে গুরুপ্রসাদবাবু ''মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ'' থেকে উৎপাদন সম্পর্কে মূল্য ও উদ্বৃত্ত মূল্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন যা প্রবন্ধটিতে ছিল না। আসলে এই প্রসঙ্গটি অন্য। ''পুঁজিবাদের অন্তর্বস্তু''র ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ আদৌ প্রবন্ধটির আলোচনার পরিধিতে ছিল না। অনীকের 'ফিরে দেখা' বিশেষ সংখ্যাটিতে সমাজতন্ত্রের পাশাপাশি পুঁজিবাদকেও ফিরে দেখার সীমিত উদ্দেশ্য নিয়ে প্রবন্ধটি লেখা— কীভাবে পুঁজিবাদ বারংবার সঙ্কট থেকে পরিত্রাণ পেতে আইনি আর্থনীতিক ব্যবস্থা গড়ে আশ্রয় করেছে এক-একটি পর্যায়কে ও বর্তমান আর্থিক পুঁজির কর্পোরেটতন্ত্র গড়ে আরেক সঙ্কটে পড়েছে।

তিনটি মূল পর্যায়ে পুঁজিবাদের আর্থনীতিক নির্মাণের কথা প্রবন্ধটিতে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়, স্বর্ণমান নির্ভর মুদ্রাব্যবস্থার যুগে শিল্প-পুঁজিবাদ, যেখানে শেষমেষ তীব্র সঙ্কট দেখা দেয় ১৯৩০ দশকে। এরপর আসে ঋণ-অর্থ-নির্ভর শিল্প-পুঁজিবাদ, যা ১৯৬০ দশকের পর গিয়ে পড়ে একযোগে শিল্পপণ্য উৎপাদনে মন্দা ও মুদ্রাস্ফীতির যুগ্ম সঙ্কটে, যাকে বলা হয় স্ট্যাগফ্লেশন। অবশেষে ১৯৭০ দশক থেকে উদ্ভব ঘটতে শুরু করে আর্থিক পণ্যের বাজার ও নির্মাণ ঘটে বর্তমান আর্থিক পুঁজিবাদের। পুঁজিবাদের নির্মাণে আইনি 'অন্তর্বস্তু' কিন্তু একটাই— কর্পোরেটতন্ত্র। গুরুপ্রসাদবাবুর অভিযোগ, এই আলোচনা ''মার্কসীয় মূল্য ও উদ্বৃত্ত মূল্যের দৃষ্টিকোণ তথা পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কের দৃষ্টিকোণ'' থেকে হাজির করা হয়নি। এমনটা না-করার কারণ অবশ্য প্রবন্ধটিতে উল্লেখ করাই ছিল— উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্বটি শিল্পসংস্থা কর্তৃক মজুরি শ্রমিককে শোষণ করার প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা মাত্র। শুধুমাত্র এই তত্ত্ব দিয়েই পুঁজিবাদের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা ও পর্যায়গুলি বিশ্লেষণ করতে যাওয়া তত্ত্বটির অপপ্রয়োগ হবে। আসলে এই কথাটিতেই গুরুপ্রসাদবাবুর আপত্তি। অথচ, আর্থিক পুঁজিবাদের কথা বাদই দিলাম, শিল্প-পুঁজিবাদের সবটাই যে শুধুমাত্র বুর্জোয়া শিল্প-উৎপাদনে শ্রমিকের উদ্বৃত্ত মূল্য শোষণ প্রক্রিয়াকে বুঝলেই বোঝা হয়ে যাবে তা নয়। এই বক্তব্যটিকে প্রতিষ্ঠা দিতে মার্কসের লেখা থেকেই উদ্ধৃত করতে হচ্ছে, কারণ সে ছাড়া হয়তো মন ভরবে না। পশ্চিম ইউরোপে শিল্প-পুঁজিবাদের নির্মাণপর্বে দেখা গিয়েছিল বুর্জোয়ারা বিশ্বের অন্যত্র, বিশেষত আমেরিকায় ঔপনিবেশিক দাম ব্যবস্থা পত্তন করে শোষণ চালাচ্ছে। এই দাম ব্যবস্থা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মার্কস লিখছেন—

Direct slavery is just as much pivot of bourgeois industry as machinary... Without slavery you have no cotton, without cotton you have no modern industry... It is the colonies that have created world trade, and it is world trade that is the pre-condition of large scale industry... Wipe out North-America from the map of the World, and you sill have anarchy— the complete decay of modern commerce and civilization." [Karl Marx, 1847, *The Poverty of Philosophy : A Reply to M. Proudhon's Philosophy of Poverty*, International Publisher, edn : New York, pp. 04-5]

'পুঁজিবাদের অন্তর্বস্তু' হিসাবে শুধুমাত্র শিল্প-শ্রমিকের উদ্বৃত্ত মূল্য শোষণকে বুঝে নিলে মার্কসবাদের পাঠ সম্পূর্ণ হয় না, তার অন্তর্নিহিত আগ্রাসী-চরিত্রকে বিশেষ করে বোঝা দরকার। এই চরিত্রটির কারণ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উদ্বৃত্ত (মূল্য মাপকাঠিতে বা যেভাবেই তা আসুক) শোষণ প্রক্রিয়াটি স্বয়ংক্রিয় ভারসাম্য অবস্থায় থাকে না। তাই তাকে টিকে থাকতে গেলে প্রয়োজন হয় বহির্বিশ্বে অপুঁজিবাদী ব্যবস্থার অস্তিত্ব, যাকে আগ্রাসনে ধ্বংস করে, শোষণ করে সে ক্রমাগত বিস্তৃত ও স্ফীত হতে পারে। প্রবন্ধটির মূল প্রতিপাদ্য ছিল পুঁজিবাদের অন্তর্নিহিত এই বিশেষ চরিত্রটি। গুরুপ্রসাদবাবুর কাছে এর আলোচনা গ্রহণযোগ্য হয়নি। আসলে আলোচনায় মার্কসীয় তত্ত্ব কাঠামোর প্রত্যক্ষ প্রয়োগ তথা উদ্বৃত্ত মূল্যের উল্লেখ না থাকলে অনেক সময়েই আমাদের মন ভরে না মার্কসীয় স্বাদের অভাবে। প্রবন্ধে উল্লিখিত পুঁজিবাদের তিনটি পর্যায়কে সরাসরি মার্কসীয় তত্ত্ব-কাঠামোয় দেখা যেতে পারে। কিন্তু তার জন্য পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রক্রিয়াটির মার্কসীয় বর্ণনা সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা প্রয়োজন। প্রক্রিয়াটি M–C–C'–M' সূত্র হিসাবে পরিচিত। লক্ষ্যণীয় এখানে শোষণ প্রক্রিয়ার শুধুমাত্র প্রথম ধাপটিকে লেখা হয়েছে। প্রক্রিয়াটি জারি থাকলে পরপর আসতেই থাকবে M'–C'–C''–M'', M''–C''–C'''–M''' ইত্যাদি। আমরা সাধারণত প্রথম ধাপটির বর্ণনা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকি, একটি সহজ প্রশ্ন মনে আসে না। তাই শোষণ প্রক্রিয়া

জারি রাখতে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটির অবশ্য প্রয়োজনীয় আগ্রাসী চরিত্রটি নজরে পড়ে না। ব্যবস্থাটির অবশ্য প্রয়োজন ক্রমাগত মুদ্রা তথা অর্থের যোগান বাড়িয়ে চলা। একটি পুঁজিবাদী ব্যবস্থা যদি M পরিমাণ স্বর্ণমান-নির্ভর মুদ্রার বিনিয়োগ দিয়ে শুরু হয়, তাহলে সেখানে বহির্বাণিজ্য বা লুণ্ঠন থেকে বাড়তি সোনা আনতে না পারলে M' পরিমাণ মুদ্রা সৃষ্টি হবে কী করে; উদ্বৃত্ত পণ্য (বা মূল্য) আর্থিক মুনাফা তথা নতুন পুঁজিতে রূপান্তরিত হবে কী করে? স্বর্ণমান-নির্ভর মুদ্রা ব্যবস্থার যুগে তাই শিল্পপুঁজিবাদের গড়ে ওঠার জন্য অবশ্য প্রয়োজন ছিল ঔপনিবেশিক শোষণে বহির্বিশ্ব থেকে সোনা নিয়ে আসা। মার্কসের লেখা থেকে উদ্ধৃতিটি আরেকবার দেখে নেওয়া যেতে পারে এই প্রসঙ্গে। কিন্তু এরও তো সীমা আছে, সোনার ভাণ্ডার অসীম নয়! তাই বহির্বাণিজ্য স্তিমিত হওয়া থেকে এসেছিল ১৯৩০ দশকের সঙ্কট।

পুঁজিবাদের দ্বিতীয় পর্বে আইনি আর্থনীতিক ব্যবস্থা হিসাবে মুদ্রার স্বর্ণমানকে ত্যাগ করে গড়ে তোলা হল ব্যাংক মারফত ঋণ-অর্থ সৃষ্টির ব্যবস্থা। সমস্যা মিটিল এক দিক থেকে, কিন্তু এল আরেক দিক থেকে। প্রক্রিয়াটি ক্রমাগত চলে বৃদ্ধি ঘটতে থাকে শিল্পপণ্যের উৎপাদন— C', C'', C''' ইত্যাদি। এখন না হয় অর্থের যোগানের কোনও সমস্যা নেই; ব্যাংক মারফত ঋণ-অর্থের যোগান ক্রমশ বেড়েই চলেছে। কিন্তু এত শিল্পপণ্য কিনবে কে? শিল্পপণ্যের বস্তুগত ভোগ-চাহিদাকে তো অসীম বাড়ানো যায় না। তার ওপর আয় বৈষম্য বৃদ্ধির কারণে ক্রয়ক্ষমতা ও এইসব ভোগ্যপণ্যের চাহিদা যে ক্রমশ সীমাবদ্ধ হচ্ছে মুষ্টিমেয় উচ্চবিত্তদের হাতে। ফলে এলো শিল্প উৎপাদনে চাহিদার মন্দা, আর সঙ্গে থাকল ঋণ-অর্থ সৃষ্টির স্রোতের ফলে মুদ্রাস্ফীতি। লক্ষ্যণীয়, মার্কসীয় তত্ত্বকাঠামোয় এই স্ট্যাগফ্লেশনকে বোঝা গেলেও এর ব্যাখ্যা কিন্তু মূলধারার অর্থনীতিতে পাওয়া যায় না।

তৃতীয় পর্বে নির্মাণ হলো আর্থিক পণ্য কেনা-বেচার ফাটকার আইনি আর্থনীতিক ব্যবস্থা। শিল্পপণ্যের চাহিদার মন্দাকে পাশ কাটিয়ে পুঁজিবাদ রাস্তা খুঁজল আর্থিক পণ্য মারফত সরাসরি আর্থিক মুনাফা করার। কোনও কোনও মার্কসীয় অর্থনীতিবিদ এই প্রক্রিয়াকে M–M' হিসাবে বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাটি সহজবোধ্য নয়। প্রবন্ধটিতে তাই আলোচনা করা হয়েছে আর্থিক পণ্যের লেনদেন থেকে আর্থিক মুনাফা করা কীভাবে ঘটছে। মার্কসীয় আবর্তচক্রটির ধারায় আমরা একে বর্ণনা করতে বরং বলতে পারি M–P–F–M', M'–P'–F''–M'', ইত্যাদি যেখানে P হল আর্থিক পণ্যের বর্তমান দাম (বা প্রেজেন্ট ভ্যালু), ও F হল তার ভবিষ্যৎ দাম বা ফিউচার প্রাইস (অথবা ফিউচার ভ্যালু)। লক্ষ্যণীয়, এই আবর্তচক্রটি ক্রমাগত চলতে গেলে প্রয়োজন ভবিষ্যৎ মূল্য তথা ফিউচার প্রাইসের ক্রমাগত বৃদ্ধি, যাকে ঘিরে পুঁজিবাদ এখন খুঁজছে তার অসীম স্ফীতির সন্ধান, এবং যা একবার থমকে গেলে আর সঙ্কটমুক্তির উপায় থাকে না। তাসের ঘর ভাঙতে শুরু করে।

গুরুপ্রসাদবাবু এই তৃতীয় পর্বটিকে সহজ করে বুঝে নিতে চেয়েছেন— আর্থিক মুনাফার একমাত্র প্রকৃত উৎস হল শিল্পউৎপাদনে শ্রমিকের শ্রম থেকে সৃষ্টি হওয়া উদ্বৃত্ত মূল্য। তাঁর বক্তব্য, ''উৎপাদন ক্ষেত্রে তৈরি হওয়া উদ্বৃত্ত মূল্যকে পৃথিবী জুড়ে ফাটকা বাজারে ঘোরানো হতে থাকে এবং খাতায় কলমে বিনিয়োগকারীদের মুনাফা বাড়তেই থাকে। মনে হতে থাকে অর্থ নিজেই নিজের বৃদ্ধি ঘটাতে পারে, তার জন্য পণ্য উৎপাদন ও তার বিক্রির ঝঞ্ঝাট পোয়ানো আবশ্যিক নয়।'' এমন সহজ ব্যাখ্যায় আর্থিক পুঁজিবাদকে বোঝার চেষ্টা বোধহয় যথেষ্ট নয়। বাস্তব চিত্রকে মেলাতে সমস্যা হয়। উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে শিল্প উৎপাদন ক্ষেত্রে মন্দা ও শ্রমিক ছাঁটাই চলেছে; জাতীয় আয়ের মাত্র ১৫-২০ শতাংশ আসে শিল্প-উৎপাদন থেকে, আর আছে বিশাল বেকারত্ব। মুনাফার একমাত্র উৎস যদি উদ্বৃত্ত মূল্য হয়, যা আসে একমাত্র শ্রমিকের শ্রম থেকে, তাহলে তো যত শ্রমিক নিয়োগ, তত উদ্বৃত্ত মূল্য ও ততই মুনাফা। সুতরাং মোটের ওপর শ্রমিকের পূর্ণ-নিয়োগ ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করে চলাই তো পুঁজিপতিদের মুনাফা বাড়ানোর একমাত্র পথ। বেকারত্ব ক্রমাগত বেড়ে চলার কথা নয়, আর শ্রমিক ছাঁটাইয়ের পথেও সচরাচর পুঁজিপতিদের যাওয়া কথা নয়। বাস্তব তো তা বলছে না।

শিল্প-উৎপাদন ক্ষেত্রে মজুরি শ্রমিকের শ্রম থেকে সৃষ্ট উদ্বৃত্ত মূল্যই পুঁজিবাদের প্রকৃত আর্থিক মুনাফার একমাত্র উৎস, এমন এক ধারণা থেকে পুঁজিবাদের তৃতীয় পর্বের সঙ্কট সম্বন্ধে গুরুপ্রসাদবাবু যে সিদ্ধান্ত উপনীত হয়েছেন তা বিভ্রান্তিকর। ওঁর বক্তব্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশাল বিশাল ব্যাংক ও বিমা কোম্পানিগুলির বিপুল মুনাফার অস্তিত্ব ছিল কাগজে কলমেই, উদ্বৃত্ত মূল্য হিসাবে নয়। শেয়ার বাজারে ধ্বস নামলে মূল্য বা উদ্বৃত্ত মূল্য উবে যায় না। খাতায় কলমে অর্জিত মুনাফা যদি তার উৎসকে ছাড়িয়ে যায়, তাহলে কোনও একটি পর্যায়ে মুনাফার একটি অংশ বাজার থেকে উবে যেতে বাধ্য। বর্তমানে সেটাই ঘটছে। এমন এক বক্তব্য কিছু সমস্যা সৃষ্টি করে। আজকাল পুঁজিপতিদের কেনা-বেচা, মুনাফা ইত্যাদি সবই হয় ব্যাংকের খাতায় কলমে (কমপিউটারে), অর্থের লেনদেন হয়ই না। ফলে কোনটা উৎস নির্ভর প্রকৃত মুনাফা এবং তার পরিমাণ কতটা সে বলা দুষ্কর। কিন্তু আরও বড় সমস্যা হল, এমন বক্তব্যের অর্থ দাঁড়ায় মুনাফার অন্য অংশটি, যা উদ্বৃত্ত মূল্য অনুযায়ী প্রকৃত মুনাফা, তা কখনোই উবে যায় না, সে যেমনটি আছে তেমনটিই থাকবে পুঁজিপতির মুনাফা হিসাবে এই সঙ্কটেও। অর্থাৎ এই সঙ্কট কোনও বুনিয়াদি বা ফান্ডামেন্টাল সঙ্কট নয়, এ শুধুই মেদ ঝরানোর পালা। পুঁজিবাদী শিল্পসংস্থায় উদ্বৃত্ত মূল্য শোষণের মার্কসীয় তত্ত্বের যান্ত্রিক প্রয়োগ ভাগ্যের পরিহাস হয়ে দাঁড়ায়— মার্কসীয় আলোচনার সিদ্ধান্তে প্রমাণিত হতে থাকে পুঁজিবাদের প্রবক্তাদের বক্তব্য— আওয়ার ফান্ডামেন্টালস্ আর স্ট্রং।

সুতনু ভট্টাচার্য

শিক্ষা সংকট

শিক্ষার গঙ্গাযাত্রা

শুভাশিস মুখোপাধ্যায়

"(ভারতের সংবিধান-প্রদত্ত) শিক্ষার অধিকার জীবনের অধিকার থেকে সরাসরি বেরিয়ে আসে ...।"
—ভারতীয় সুপ্রীম কোর্ট-এর মাননীয় প্রধানবিচারপতি শ্রী উন্নিকৃষ্ণণের রায়-এর অংশ।

গোড়ার কথা

সত্তরের দশকের সেই উত্তাল দিনগুলোর গোড়ার দিকে আমাদের হাতে 'শিক্ষা ও শ্রেণী সম্পর্ক' নামের একটি প্রবন্ধ সংকলন হাতে আসে— লেখক 'নন্দন' পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক, বিখ্যাত বুদ্ধিজীবী সৈয়দ শাহেদুল্লাহ। চমৎকার ভাষা ও উদাহরণ সহযোগে তিনি উদ্ঘাটিত করেছিলেন আমাদের চালু শিক্ষা ব্যবস্থার শ্রেণীভিত্তিটিকে। সত্তরের বিদ্যার্থী-বিদ্রোহ মিলিটারি বুটের তলায় পিষ্ট হওয়ার পর আশির গোড়ায় ডান-বাম নির্বিশেষে যাবতীয় মতাদর্শের মানুষরা শিক্ষাক্ষেত্রে সত্তর দশকের 'ভয়ঙ্করী নিশীথিনীর অগস্ত্যযাত্রা' কামনা করলেন। ততদিন চারপাশে শ্রেণী নিয়ে, শ্রেণীভিত্তিক শিক্ষা নিয়ে ভাবনায় ভাটার টান এসেছে।

পূর্ব কথা

আসন্ন লোকসভা অধিবেশনে ভারত সরকার 'শিক্ষা সংস্কার'-এর জন্য এক সঙ্গে পাঁচটা উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত বিল পাশ করতে চলেছে। শিক্ষা নিয়ে ভারত সরকারের হঠাৎ এত মাথা ব্যথা দেখে ভারতের আম-জনতা কিছুটা সন্দিহান। আম জনতার অতীত অভিজ্ঞতা হলো যে গ্যাট চুক্তির সই দিয়ে ভারত সরকার দেশের জন্য উপকারী পেটেন্ট আইন দফায় দফায় পরিবর্তিত করেছে। এই পরিবর্তনের ফলে ভারতের ভেষজ ও বস্ত্রশিল্প লাটে উঠে গেছে। *সেজ*-এর মতো বেআইনি জিনিসকে মান্য আইনের রূপ দেওয়ার জন্য ভারত সরকার সর্বমোট ১০৪টি আইনের পরিবর্তিত করেছে। আমজনতার আশঙ্কা, উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রেও বুঝি এমন ভয়ানক একটা কিছু ঘটতে চলেছে।

সরকার এখন তার কৌশল পরিবর্তন করে সামাজিক ক্ষেত্রে পরিবর্তিত আইন আনছে। পরিবর্তিত আইনের নামগুলি দেখে মনে হতে পারে যে আইনগুলো বুঝি আম-জনতার সুবিধের জন্য। কিন্তু জনতা অভিজ্ঞতা থেকে যে সত্য বুঝে গেছেন, এই নিবন্ধে তা আমরা যুক্তি-তথ্য-তত্ত্ব সহকারে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করবো।

উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত যে পাঁচটি বিল আমাদের আলোচ্য, তার প্রতিটিই উচ্চশিক্ষার পাঁচটি অতি স্পর্শকাতর ক্ষেত্রে নজরদারির উদ্দেশে গৃহীত হবে বলে প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য করেছেন। ভারতে ইতিমধ্যেই ব্যাঙের ছাতার মতো 'বিদেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান' গজিয়ে উঠেছে, যারা ভারতের মাটিতে ভারতীয় পড়ুয়াদের কাছ থেকে বিপুল অর্থ নিয়ে হরেক রকমের দেশি-বিদেশি 'ডিগ্রি' দিচ্ছে। এদের অরাজকতা বন্ধ করার জন্য, এদের শিক্ষার গুণমান যাচাই করার জন্য নজরদারি প্রয়োজন। যে সব পড়ুয়ারা টাকার বিনিময়ে এই সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে 'শিক্ষা পরিষেবা' গ্রহণ করবে, সেই সব ভোক্তা পড়ুয়ারা তাদের খরচ করার টাকার সমতুল্য 'শিক্ষা পরিষেবা' পাচ্ছে কিনা তার জন্যও নজরদারি দরকার। এই সব কারণেই ভারত সরকারের কাছে 'দ্য ফরেন এডুকেশন ইনস্টিটিউশন বিল-২০১০' বা সাদা বাংলায় বিদেশি শিক্ষা সংস্থা সংক্রান্ত বিল পাশ করানো জরুরি হয়ে পড়েছে।

অন্য বিলগুলিও 'জনস্বার্থে' পাশ করানো প্রয়োজন। যেমন 'শিক্ষার দুর্নীতি আটকানো'-র জন্য আসছে 'শিক্ষা ক্ষেত্রে অনৈতিক বিষয় নিরোধ সংক্রান্ত বিল-২০১০', বা ভুয়ো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আটকানোর জন্য আসছে 'দ্য ন্যাশনাল অ্যাক্রেডিশন বিল-২০১০'। তেমনি শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় অভিযোগ একটিমাত্র সংস্থার মাধ্যমে দ্রুত নিষ্পত্তি-র জন্য রয়েছে 'শিক্ষা ট্রাইব্যুনাল বিল-২০১০' এবং শেষমেষ 'উচ্চশিক্ষার দুর্নীতি' নিরোধের জন্য থাকছে 'দ্য ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর হায়ার এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ বিল-২০১১'। গ্যাট চুক্তির পর ভারতের বুনিয়াদি আইনগুলি পরিবর্তনের জন্য সরকারের যে তাগিদ দেখা যাচ্ছে, তাতে মনে হয়, উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এক ধাক্কায় এত নতুন আইনের আয়োজনের পেছনে হয়ত অন্য কোনও রহস্য রয়েছে। তাই সামান্য ইতিহাস চর্চা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

কাঠামোগত আর্থিক সংস্কার— শিক্ষায় তার প্রভাব

১৯৮৬ সালে ভারতের সদ্য-প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখার্জী গ্যাটচুক্তিতে সই দেওয়ার পর গঙ্গা-যমুনা-গোদাবরী দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গেছে। এই সময় থেকে বর্তমান সরকার পর্যন্ত সমস্ত সরকারই উৎসাহভরে তথাকথিত 'আর্থিক উদারনীতি' ও 'কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস' প্রক্রিয়া চালিয়ে গেছে।

এই রকম এক আর্থিক অবস্থার প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রসংঘের তিনটি সংস্থা, যেমন ইউএনডিপি, ইউনেসকো ও ইউনিসেফ এবং বিশ্বব্যাঙ্ক থাইল্যান্ড-এর জমতিয়েন শহরে ১৯৯০-এর মার্চ মাসে শিক্ষা সংক্রান্ত একটি সম্মেলনের আয়োজন করে। সম্মেলনের নামটি যতটা গালভরা ছিলো, ততটাই ছিলো নির্দোষ—

'সকলের জন্য শিক্ষা বিষয়ক বিশ্ব সম্মেলন : মৌলিক প্রয়োজন মেটানোর পদক্ষেপসমূহ'। এই সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে দুটি প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। একটি হলো 'সকলের জন্য শিক্ষা বিষয়ক সারা বিশ্বের ঘোষণা' এবং অন্যটি হলো 'বুনিয়াদি শিক্ষা বিষয়ক পদক্ষেপ গ্রহণের কাজ সংক্রান্ত ঘোষণা'। ভারত এই দুই ঘোষণাতেই উৎসাহভরে সই দেয়। আজ পেছন ফিরে দেখলে বোঝা যায় যে এই দুটি ঘোষণাই ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে 'কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস' ও শিক্ষার বাণিজ্যকরণের ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে। বিশ্বব্যাঙ্ক এই দুটি ঘোষণাকে 'জমতিয়েন ঘোষণা' বলে পরিচিত করে তোলে।

একটি সজ্ঞান হত্যার কাহিনী

ভারত সরকার গ্যাট চুক্তিতে সই দেওয়ার পর তথাকথিত 'প্রথম প্রজন্ম'-র 'কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস ও আর্থিক সংস্কার' রূপায়ণের জন্য ১৯৯৫ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত সময় পেয়েছিলো। 'দ্বিতীয় প্রজন্ম'-র 'সংস্কার'-এর জন্য সময়সীমা নির্দিষ্ট ছিলো ২০০০ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত। গ্যাট চুক্তির একটি ধারার ব্যাখ্যা করে বিশ্বব্যাঙ্কের কর্তারা ভারতের মুরব্বিদের বোঝায় যে, বিশ্বব্যাঙ্ক-এর ঋণ নিয়ে 'আর্থিক উদারিকরণ' নীতি রূপায়ণ করতে হলে ভারতের প্রাথমিক বা বুনিয়াদি শিক্ষাক্ষেত্রে বিদেশি এবং বেসরকারি লগ্নিতে বিপুল ছাড় দিতে হবে। এই ছাড় আইন-মোতাবেক দিতে পারলে ভারতের বুনিয়াদি শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারি লগ্নির একটা অংশ উদ্বৃত্ত হবে, আর সেই অংশটি দিয়ে 'কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস'-এর কাজ 'ত্বরান্বিত' করা যাবে!

কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে এই 'উদ্বৃত্ত অর্থ' অর্থ দিয়ে 'পুনর্বিন্যাস ত্বরান্বিত' করা যাবে, বিশ্বব্যাঙ্ক তার এক বিরাট তালিকা দেয়। আমাদের এই নিবন্ধের জন্য প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রগুলি হলো 'সামাজিক সুরক্ষা সংক্রান্ত ক্ষেত্রে রক্ষাকবচ প্রত্যাহার জনিত ক্ষতিপূরণ' এবং 'শিক্ষা সংকোচন সংক্রান্ত ক্ষতিপূরণ'। প্রথম শ্রেণীর 'ক্ষতিপূরণ'-এর ফল হলো নয়া পেনসন বিল-এর মাধ্যমে পেনসন সংক্রান্ত সামাজিক সুরক্ষার একটি বড় অংশ প্রত্যাহার। দ্বিতীয় 'ক্ষতিপূরণ'টি নিয়ে আলোচনার আগে আমরা একবার দেখে নিই ভারত সরকার জমতিয়েন ঘোষণার সই দেওযার পর শিক্ষাক্ষেত্রে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

থাইল্যান্ড-এর শিক্ষা সংক্রান্ত বিশ্ব সম্মেলন থেকে ফেরত এসেই ভারতীয় প্রতিনিধিবৃন্দ এই দেশের আগামী কুড়ি বছর শিক্ষাক্ষেত্রে জমতিয়েন ঘোষণা রূপায়ণের উদ্দেশ্যে একটি দীর্ঘকালীন রূপরেখা বা রোড-ম্যাপ প্রস্তুত করার জন্য একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করে। ভারতের জন্য এই কুড়ি বছরের জন্য দীর্ঘকালীন রূপরেখা তৈরির সময় এই কমিটি 'দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করে' যে, শিক্ষা ভারতীয় সমাজ ও রাষ্ট্রের এমনই এক 'কল্যাণকর উপাদান', যা ভারত রাষ্ট্র 'বিনা পয়সায়' তার নাগরিকদের 'দিতে বাধ্য'। ভারতের সংবিধানের যে নীতিমূলক নির্দেশমালা, আইন করে যা পরিবর্তন করা যায় না, সেই নির্দেশমালার জন্য ভারত রাষ্ট্রের বাধ্যতামূলক সাংবিধানিক কর্তব্য-র মধ্যে এই অবৈতনিক শিক্ষাদান পড়ে। ভারতের সুপ্রিম কোর্ট-ও দফায় দফায় এ নিয়ে নির্দেশ দিয়েছেন। সর্বশেষ সুপ্রিম কোর্ট-এর প্রধান বিচারপতি উন্নিকৃষ্ণাণের রায়ে অবৈতনিক শিক্ষাদানের বিষয়টি সত্বর রূপায়ণ নিয়ে বিস্তৃত নির্দেশ রয়েছে।

ঐ রূপরেখা 'আরও দুঃখের সঙ্গে নজর করেছে যে গ্রামে গ্রামে দরিদ্র ভারতবাসীর ছেলেপিলেদের জন্য অবৈতনিক বিদ্যালয় চালালে বেসরকারি আর্থিক লগ্নিকারী সংস্থার কোনও মুনাফা হবে না'। ঠিক এই কারণেই জমতিয়েন ঘোষণা অনুসারে ভারতকে 'শিক্ষাক্ষেত্রে বিদেশি ও বেসরকারি লগ্নিতে উৎসাহ' দেওয়ার 'ক্ষেত্রটি যথোপযুক্ত উপায়ে প্রস্তুত করতে হবে'।

সরকারি সুপারিশ, না হত্যার হাতিয়ার?

অতএব এই কমিটি ভারতের বুনিয়াদি তথা সমগ্র শিক্ষাক্ষেত্র থেকে সরকারি উদ্যোগ প্রত্যাহার করে সেই ছেড়ে দেওয়া ক্ষেত্রগুলিতে বিদেশি এবং বেসরকারি লগ্নিতে উৎসাহদানের জন্য স্পষ্ট ভাষায় সুপারিশ করে বলে :

শিক্ষাক্ষেত্রে ভারত রাষ্ট্রের যে 'সাংবিধানিকভাবে নির্দিষ্ট বাধ্যতামূলক সামাজিক কল্যাণকর অ-মুনাফাভিত্তিক সামাজিক ব্যয় ও লগ্নি' রয়েছে তা দ্রুত প্রত্যাহার করতে হবে। এই লগ্নি প্রত্যাহার না করলে শিক্ষাক্ষেত্রটি বিদেশি ও বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের কাছে আকর্ষণীয় হবে না। কিন্তু ভারত সরকারের পক্ষে 'সংবিধান সংশোধন' করে আইনি পদ্ধতিতে এই প্রত্যাহারের কাজটি সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। সংবিধান মতে এই দায়িত্বটি কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের যৌথভাবে করার কথা। এই দায়িত্ব প্রত্যাহার করার একটি ধাপ হিসেবে প্রথমে এই দায়িত্ব পুরোপুরি চালান করতে হবে রাজ্যের হাতে এবং এই দায়িত্ব পালনের জন্য রাজ্যকে কোনও বাড়তি আর্থিক বরাদ্দ মঞ্জুর করা হবে না।

এই কাজটি যেহেতু আইন সংশোধন করেই করা সম্ভব, তাই দ্বিতীয় ধাপ হিসেবে শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন সংশোধন করতে হবে, প্রয়োজনে নতুন আইন প্রবর্তন করতে হবে। পাশাপাশি তৃতীয় ধাপ হিসেবে শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারি লগ্নি কমিয়ে এনে এই ক্ষেত্রটিকে এমনভাবে অকেজো করে দিতে হবে যে জনমানসে সরকারি শিক্ষাসংস্থাগুলির যেন কোনও বিশ্বাসযোগ্যতা না থাকে। পরের ধাপ হবে আইন পরিবর্তন বা নতুন আইন প্রবর্তন করে 'বিদেশি লগ্নি-বান্ধব পরিবেশ' এবং 'শিক্ষাক্ষেত্রে বিদেশি ও বেসরকারি লগ্নির মুনাফা নিশ্চিত করার আইনগত সুরক্ষা' দেওয়া। রূপরেখাটি একদম স্পষ্ট। এই সুপারিশের মধ্যে কেউ যদি দেশদ্রোহিতার উপাদান খুঁজে পান তো আমি নাচার!

সরকারি সুপারিশের ফল

এই সমস্ত সুপারিশ মোতাবেক ভারত সরকার ক্রমে ক্রমে শিশু শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারি লগ্নির বিকল্প হিসেবে বেসরকারি লগ্নির প্রয়োজনীয়তা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আদা-নুন খেয়ে লেগে পড়ে। এই কাজ 'সুষ্ঠুভাবে' করার জন্য বিদেশি সাহায্যপুষ্ট বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, ধর্মীয় সংস্থা এবং কর্পোরেট সংস্থাকে সস্তায় জমি, কর ছাড়, সুলভে ব্যাংক ঋণ ইত্যাদি নানান সুবিধে দিতে থাকে। বস্তুত আমাদের দেশের শিশু শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাক্ষেত্রটি প্রায় পুরোপুরি বেসরকারি হাতে চলে গেছে।

ভারতের সংবিধান-রচয়িতারা ১৪ বছর বয়েস পর্যন্ত পড়ুয়াদের বাধ্যতামমূলক অবৈতনিক শিক্ষার আওতায় আনার বিষয়টি ১৯৬০-এর মধ্যেই রূপায়িত করার কথা ঘোষণা করেছিলেন। ষাটের দশকের গোড়ায় দেখা গেল, কাজের কাজ কিছুই হয়নি। তখন ভারতের শিক্ষা কমিশন শুধুমাত্র সপ্তম-অষ্টম শ্রেণীর জন্য এই কাজটি ১৯৭৫-এর মধ্যে শেষ করার কথা বলে। রাজীব গান্ধীর নয়া শিক্ষানীতিতে কেবল পঞ্চম শ্রেণীর এই বাধ্যতামূলক শিক্ষা ১৯৯০-এ শেষ করার কথা বলে। এরপর জমতিয়েন ঘোষণা মোতাবেক ভারত সরকার এই বাধ্যতামূলক শিক্ষার আওতায় থাকা পড়ুয়াদের বয়স, শিক্ষার মান ইত্যাদি ক্রমাগত কমিয়ে এনেছে, এবং সেই কমিয়ে আনা লক্ষ্যমাত্রা পূরণের জন্যও কোনো সময়সীমা নির্দিষ্ট করা থেকে বিরত থেকেছে। কিন্তু এত কিছু করেও 'শেষরক্ষা' হয়নি। ১৯৯৩ সালে সুপ্রিম কোর্টে যখন উন্নিকৃষ্ণাণের রায় গৃহীত হয়, তখন ভারত সরকার তার সংবিধানিক দায় এড়ানোর জন্য পরপর অনেকগুলি সংবিধান সংশোধনী প্রস্তাব গ্রহণ করে শিক্ষার বেসরকারিকরণের প্রাথমিক রাস্তাটি পরিষ্কার করে ফেলে।

সংবিধান সংশোধন, না সংহার?

সাইকিয়া রিপোর্ট-এর প্রেক্ষিতে ভারত সরকার সংবিধানের ৮৩-তম সংশোধনী (১৯৯৭) এনে শিক্ষাকে সাংবিধানিক মৌলিক অধিকারের তালিকা থেকে হটিয়ে দেয়। এই সংশোধনীর হাত ধরে আসে সংবিধানের ৮৬তম সংশোধনী, যা ২০০২ সালে রাজ্যসভা এবং লোকসভাতে, বামপন্থী ও অন্য সাংসদদের উপস্থিতিতে কোনও বিরোধিতা ছাড়াই গৃহীত হয়। বলা বাহুল্য এই দুটি সংশোধনীই যেহেতু সংবিধানের নীতিমূলক নির্দেশনামাকে পরিবর্তিত করতে চাইছে, তাই তারা সংবিধান-বিরোধী। কিন্তু আইনত অন্যায্য এই সংশোধনীর মাধ্যমে সরকার বুনিয়াদি শিক্ষার স্তর থেকে ছয় বছরের কমবয়সী পড়ুয়াদের ছেঁটে দেয় (আগে পাঁচ বছর বয়সী থেকে শিশুদের ধরা হতো)। এর ফলে এক ধাক্কায় ভারতের ১.৭ কোটি শিশু পড়ুয়াদের (ছয় বছরের কম বয়সের) সরকার বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষার বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিলো। সংবিধানের যে দুটি 'সংশোধনী'-র কথা বলা হলো, সেই 'সংশোধন'-এর ফলে ছ'বছরের কমবয়সী পড়ুয়াদের আর বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষা পাওয়ার সংবিধানগত অধিকার থাকল না! সুপারিশের দ্বিতীয় স্তরটি রূপায়ণের উদ্দেশ্যে এরপর ভারত সরকার ৬-১৪ বছরের পড়ুয়াদের অবৈতনিক শিক্ষার বিষয়টি একতরফাভাবে রাজ্যের হাতে চাপিয়ে দেয় (সংবিধানের সংশোধিত ধারাটি দেখলেই বিষয়টি পরিষ্কার হবে)। কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলো আবার শিশু শিক্ষার দায়িত্ব চাপিয়েছে পড়ুয়াদের পরিবার এবং অভিভাবকদের ওপর। শিশুর শিক্ষার জন্য নাকি তাদের পরিবার ও গুরুজনদের 'শিশু-শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে'। এবং অতি সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার একটি আর্থিক আদেশ জারি করে রাজ্যগুলিকে অবৈতনিক শিশু শিক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দর ৩০ শতাংশ অর্থ ছেঁটে দিয়েছে।

সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধ্বংসস্তূপের ওপরই এদেশে গড়ে উঠেছে বহুস্তরীয় এক বিদ্যালয় ব্যবস্থা। একদিকে যেমন রয়েছে দিল্লি পাবলিক স্কুল, হেরিটেজ, ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের মতো অতি দামি দামি স্কুল, অন্য দিকে রয়েছে সরকারি পরিচালনায় পৌর-নিগম বিদ্যালয় এবং ধুঁকতে থাকা মাতৃভাষা-মাধ্যমের স্কুলগুলি। সমাজের যে অংশের পড়ুয়ারা অবৈতনিক শিক্ষার সুযোগ পেলে তবে তাদের ঘরের ছেলে-মেয়েদের স্কুলে পাঠাতে পারে, তারা এখন হয় নিকৃষ্ট মানের সরকারি স্কুলে তাদের ছেলে-মেয়েদের পড়তে পাঠায়, অথবা তাদের বাড়ির শিশুরা অল্প মজুরির শিশু-শ্রমিকে পরিণত হয়ে বেসরকারি মালিকের মুনাফা বাড়ায়!

'প্রথম প্রজন্মের সংস্কার' মোটামুটি সম্পন্ন হওয়ার পর ভারত সরকার এরপর গ্যাট-এর পরবর্তী ধাপ, অর্থাৎ গাট্স বা 'পণ্য ও পরিষেবা সংক্রান্ত সাধারণ সমঝোতা'-তে সই দেয়। এই গাট্স সমঝোতা মতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য অবশ্য-প্রয়োজনীয় পরিষেবা (যেমন পানীয় জল, খাদ্য, বাসস্থান এবং পরিবহন)-কে মূলত পণ্য হিসেবে মেনে নেওয়া হয়েছে। অতএব বাজার থেকে অন্যান্য পণ্য কেনার জন্য যেমন টাকা গুণতে হয়, শিক্ষা-র জন্যও তেমনি চড়া হারে টাকা গুণতে হবে। জমতিয়েন ঘোষণাতে এই বিষয়টি স্পষ্ট করে বলা থাকলেও তার রূপায়ণ পদ্ধতি নিয়ে কিছুটা সংশয় ছিলো, কিন্তু পরবর্তী ধাপ হিসেবে যে 'ডাকার ঘোষণা' আসে, তাতে রূপায়ণ পদ্ধতির ছকটি আরও পরিষ্কার হয়ে যায়। বলা বাহুল্য, ভারত সরকার বিনা বাধায় এই 'ডাকার ঘোষণা'-তেও সই দিয়ে দেয়।

গ্যাট-পরবর্তী প্রাথমিক শিক্ষার হালচাল

স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় কংগ্রেস নেতাদের রাজনীতিতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে নজরুল ইসলাম একটি তীব্র ব্যাঙ্গাত্মক কবিতা লেখেন; তার দুটি পংক্তি হলো :

এল কোটি টাকা, এল না স্বরাজ
টাকা দিতে নারে ভুখারী সমাজ...

টাকা দিতে নারে ভুখারী সমাজ— এই বর্ণনাটা গ্যাট-পরবর্তী প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে মিলে যায়! ভারতের দরিদ্র জনসাধারণ 'বুনিয়াদি শিক্ষা পরিষেবা' 'কিনতে' আর্থিক দিক থেকে অপারগ হয়ে পড়েছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে হু হু করে বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়লেও পড়ুয়াদের উপকার হওয়ার বদলে অপকারই হয়েছে। বেসরকারিকরণের ফলে প্রাথমিক বা বুনিয়াদি শিক্ষার বেহাল অবস্থার সামান্য কয়েকটি দিক বর্ণনা করে আমরা উচ্চশিক্ষার গঙ্গা যাত্রার কাহিনীটি শোনাবো।

প্রাথমিক শিক্ষা : কিছু তথ্য

২০১১ সালে ওইসিডি-র আর্থিক সহায়তায় 'পিসা' নামক একটি সমীক্ষা সংস্থা সারা পৃথিবীর ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের অংক কষা এবং মাতৃভাষায় ছাপার অক্ষরে লেখা ২০-২৫ লাইন গড় গড় করে পড়তে পারার দক্ষতার ভিত্তিতে শিশুদের জন্য একটি দক্ষতা-তালিকা প্রকাশ করে। মোট ৭৪টি দেশের প্রায় এক কোটি পড়ুয়াদের মধ্যে এই সমীক্ষা থেকে জানা যাচ্ছে এই তালিকায় ভারতের শিশুদের স্থান ৭৩-তম হিসেবে। ভারতের তলায় রয়েছে একমাত্র কিরঘিজস্থান দেশটি। ভারতের জন্য 'পিসা' এই সমীক্ষার জন্য হিমাচল প্রদেশ ও তামিলনাড়ুকে বেছে নিয়েছিলো। সারা ভারতের ক্ষেত্রেও অবস্থাটি এমন কিছু আশাব্যঞ্জক নয়। 'প্রথম' সংস্থার বার্ষিক শিক্ষা প্রতিবেদনে সারা ভারতের শিশুদের ওপর সমীক্ষা রিপোর্ট থেকেও জানা যাচ্ছে যে ভারতের শিশুরা সহজ যোগ-বিয়োগ করতে পারে না। মাতৃভাষায় পড়া এবং লেখার ক্ষেত্রে তাদের দক্ষতা একেবারেই কহতব্য নয়।

বুনিয়াদি (লিখতে-পড়তে পারা এবং গণিত শিক্ষা) শিক্ষা চলে বিদেশি আর্থিক সাহায্যপ্রাপ্ত সর্বশিক্ষা মিশন প্রকল্পের মাধ্যমে। 'পিসা'র সাম্প্রতিক রিপোর্ট (মার্চ ২০১২) থেকে জানা যাচ্ছে যে যদিও সর্বশিক্ষা মিশন শিশু প্রতি বরাদ্দের পরিমাণ গত শিক্ষা বর্ষ থেকে দ্বিগুণ করে দিয়েছে, কিন্তু বাজেটে এই বাড়তি বরাদ্দ শিশুদের শিক্ষাখাতে সরাসরি ব্যবহৃত না হয়ে শিক্ষকদের মাইনে, শিক্ষকদের বাড়তি প্রশিক্ষণ ইত্যাদি খাতে ব্যয় করা হচ্ছে। হিসেবে দেখা যাচ্ছে শিশুদের জন্য শিক্ষাখাতে বরাদ্দ করা অংশের ৪৪ শতাংশই খরচ হয় শিক্ষকদের পেছনে। কোনও কোনও রাজ্য শিশু-শিক্ষা খাতে বরাদ্দ অর্থের ৭২ শতাংশই শিক্ষকদের মাস মাইনে দিতে খরচ করে ফেলে। সরাসরি শিশু-শিক্ষা খাতে সর্বশিক্ষা মিশন বরাদ্দ করা অর্থের মাত্র ১০ শতাংশ ব্যয় করে। ২০১১ থেকে ২০১১— এই দশ বছরের তথ্য থেকে 'পিসা' জানাচ্ছে যে, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের পেছনে এত বিপুল অর্থ ব্যয় করার সঙ্গে পড়ুয়াদের শিক্ষার মান উন্নত হওয়ার কোনও প্রত্যক্ষ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা যাচ্ছে না, এবং দ্বিতীয়ত সর্বশিক্ষা মিশন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগের সময়ে পড়ুয়াদের শিক্ষার মানের চেয়ে সর্বশিক্ষা মিশন প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর এই মিশনের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা ঢেলে সাজানো সত্ত্বেও পড়ুয়াদের শিক্ষার মান (রাশিবিজ্ঞান-সম্মত অর্থে) নিশ্চিতভাবেই খারাপ হয়েছে।

১৯৯০-এর পর ভারত তার বুনিয়াদি শিক্ষা ক্ষেত্রটিকে বিশ্বব্যাঙ্ক নির্দেশিত পথে বিন্যস্ত করে নিয়েছে বলা যায়। বিশ্বব্যাঙ্ক, বা গ্যাট বা গাট্‌স নির্দেশিত পথের দিশা হলো বুনিয়াদি শিক্ষা ক্ষেত্রে ক্রমশ বেশি বেশি করে বেসরকারিকরণ করা, শিক্ষার পণ্যায়ন করা, রাষ্ট্রের সাংবিধানিক দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলা এবং বিদেশি ও বেসরকারি লগ্নিকারীরা যাতে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিযোগিতাহীন আবহাওয়ায় লগ্নি করতে পারে, সেই জন্য বুনিয়াদি শিক্ষার সরকারি পরিকাঠামোটি পরিকল্পিত ভাবে ধ্বংস করে দেওয়া।

এর মানে অবশ্য এই নয় যে বিশ্বায়নের সমর্থক যে উঠতি বড়লোকরা এখন ভারতে মুরুব্বি হয়ে উঠছে, সরকার তাদের কোনোরকম অসুবিধায় ফেলেছে। সরকার বুনিয়াদি শিক্ষা ছেঁটে দিয়ে ওদের জন্য সারা দেশে ৬০০০ টি আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে এবং রাজীব গান্ধী প্রবর্তিত নবোদয় ও কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়-এর দেশব্যাপী সংগঠনকে বাড়তি অর্থ সাহায্য দিয়ে তাদের চাঙ্গা করে তোলা হয়েছে।

উচ্চ শিক্ষার গঙ্গাযাত্রা

বুনিয়াদি শিক্ষা-সংহার সমাপ্ত করার পর সরকার অতঃপর উচ্চশিক্ষাকে লাটে তোলার আয়োজন করেছে। আর সেই উদ্দেশ্যেই সরকার এক ধাক্কায় উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত এতগুলো বিল লোকসভায় পাশ করাতে চাইছে।

ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে কুড়ি বছরের যে রূপরেখার কথা বলে আমরা বুনিয়াদি শিক্ষা সংহারের বিবরণ দিলাম, সেই রূপরেখার সুপারিশ অনুসারে ভারত সরকার ১৯৯৪ সালে উচ্চশিক্ষার জন্যও একটি উচ্চ-ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি গঠন করে। এই কমিটির প্রথম সুপারিশই ছিলো যে, ১৯৪৭ সাল থেকে ভারত সরকার উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে যে 'অলাভজনক সামাজিক লগ্নি' করে আসছে তা প্রত্যাহার করে নিতে হবে।

এই সুপারিশের 'ফল' মেলে হাতে হাতে। অষ্টম (১৯৯২-১৯৯৭) এবং নবম (১৯৯৭-২০০২) পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিক্ষাখাতে মোট বরাদ্দের মাত্র ৭-৮ শতাংশ উচ্চ শিক্ষার জন্য সরিয়ে রাখা হয়। অথচ ভারতে যখন চরম আর্থিক সংকট চলছে, সেই সময় পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতেও (১৯৬৯-১৯৭৪) শিক্ষাখাতে মোট বরাদ্দের ২৫ শতাংশ উচ্চ শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট ছিলো।

ছাত্রদের ওপর খাঁড়ার ঘা

আর্থিক বরাদ্দ কমে আসায় উচ্চশিক্ষায় গবেষণা, গ্রন্থাগার, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি খাতেও ব্যয় কমে যায়, কমে যায় শিক্ষক-

গবেষক-টেকনিক্যাল কর্মী নিয়োগও। ২০০১ থেকে ২০১১— এই দশ বছরে ভারতের বিদ্যাচর্চার কেন্দ্রগুলিতে ৩০ থেকে ৮০ শতাংশ পদ শূন্য রয়েছে। টেকনিক্যাল বা গবেষকদের যত পদ শূন্য পড়ে আছে, তার মাত্র ৭ শতাংশ এখন পর্যন্ত পূরণ করা হয়েছে।

উচ্চশিক্ষায় উৎসাহী অর্থনৈতিক দিক থেকে পশ্চাদপদ ধীশক্তি সম্পন্ন পড়ুয়ারা এতদিন 'মেরিট-কাম-মিনস' জলপানি পেত, যার সংখ্যা গত দুটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে কমেছে ৩০ থেকে ৬০ শতাংশ। উৎকর্ষের পরিবর্তে পড়ুয়াদের এখন বাছাই করা হচ্ছে তাদের 'ঋণ পরিশোধযোগ্যতা'-র ভিত্তিতে। ভারত সরকার এখন ঋণ পরিশোধযোগ্যতার ক্ষমতার ভিত্তিতে পড়ুয়াদের উচ্চ শিক্ষা সম্পন্ন করার জন্য অল্প সুদে ঋণ দিচ্ছে। সাদা বাংলায় বলা যায় যে, সরকার তার কল্যাণমূলক ব্যবস্থা গুটিয়ে নিচ্ছে, পাশাপাশি অর্থনৈতিক দিক থেকে পশ্চাৎপদ পড়ুয়াদের একটি বড় অংশের জন্য সামাজিক ভরতুকি তুলে দিচ্ছে, এদের কাছ থেকে উচ্চশিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় সুদে-আসলে পুরো উশুল করে নিচ্ছে।

উচ্চ শিক্ষা নিয়ে বিলগুলি— বিতর্ক কী নিয়ে?

প্রায় বিনা বাধায় ভারতের বুনিয়াদি শিক্ষা ব্যবস্থাটি ধ্বংস করতে পারার ফলে ভারত সরকার উচ্চশিক্ষা ধ্বংসের জন্য আর প্রায় কোনও চাতুরিরই আশ্রয় নেয়নি। ১৯৯৩ সালে জমতিয়েন ঘোষণা মোতাবেক শিক্ষার জন্য ২০ বছরের যে রূপরেখাটি বানানো হয়েছিলো, সেই মোতাবেক ২০ বছর পর উচ্চশিক্ষাকে বেসরকারিকরণের আওতায় আনার কথা। উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত যে পাঁচটি বিল আসতে চলেছে সেই বিলগুলির প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বিলগুলির মুখবন্ধে এই বেসরকারিকরণের বিষয়টি স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। যেমন, সরকারি সংস্থাগুলির শিক্ষাসংক্রান্ত পরিষেবা দানের দক্ষতা বেসরকারি সংস্থার চেয়ে অনেক কম। তাই উচ্চশিক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি ক্রমে ক্রমে বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়াই দেশের পক্ষে মঙ্গল। অন্য এক জায়গায় বলা হয়েছে যে ভারত সরকারের আর্থিক সঙ্গতির সীমাবদ্ধতার কারণে উচ্চশিক্ষার সার্বিক প্রসারের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সরকার লগ্নি করতে পারবে না। এই লগ্নির জন্য বিদেশি এবং বেসরকারি লগ্নিকারীদের দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া গতি নেই। বিদেশি এবং, বেসরকারি লগ্নিকারী সংস্থাগুলো যাতে উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে এই লগ্নি করে, তার জন্য ভারত সরকারের তরফে প্রয়োজনীয় আবহাওয়া এবং আইনি ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন।

আরও বলা হয়েছে যে, ভারতের সংবিধানে নাগরিকদের শিক্ষা পাওয়া সংক্রান্ত মৌলিক অধিকার, সমতা, সামাজিক ন্যায়ের বিষয়ে যে সব দায়বদ্ধতার কথা বলা আছে, সেগুলিকে এখন দক্ষতা, প্রতিযোগিতা এবং মুনাফার নিরিখে খতিয়ে দেখার সময় এসেছে, কেননা ভারত সরকার এখন মনে করে যে *শিক্ষা একটি বাণিজ্যিক পণ্য*।

যথেষ্ট আইনি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দিতে না পারলে কর্পোরেট সংস্থা শিক্ষাক্ষেত্রে লগ্নি করবে না। তাই ভারতের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার বর্তমান দিশা হবে কর্পোরেট সংস্থার জন্য প্রয়োজনীয় মানবসম্পদ উৎপাদন করা। ভারতের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা এতদিন সামাজিক ন্যায় এবং সামাজিক চাহিদার ওপর ভিত্তি করেই বিন্যস্ত হয়ে এসেছে। কিন্তু দক্ষতা ও প্রতিযোগিতার কথা বিচার করে এখন থেকে জ্ঞান, প্রশিক্ষণ এবং গবেষণা, পঠন-পাঠন ইত্যাদি বিষয়গুলি বাজারের চাহিদার ওপর নির্ভর করে বিন্যস্ত করতে হবে।

পড়ুয়াদের দুর্গতি

সরকারি পরিকাঠামো অকেজো করে দিয়ে সরকার এখন বেসরকারি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মাইনে সহ অন্যান্য লুকোনো খরচ ৩-৪ গুণ থেকে প্রায় ৫০ গুণ বাড়ানোর প্রস্তাবেও অনুমোদন দিয়েছে। পাশাপাশি সরকার বস্তি উচ্ছেদ করে, আদিবাসীদের বাসস্থান উচ্ছেদ করে বিদেশের অতি নিকৃষ্ট মানের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলোকে সস্তায় জমি দেওয়ার ব্যবস্থা করার পর, বিদ্যুৎ ও অন্যান্য শুল্কে ছাড় সহ আর্থিক উৎসাহ দরাজ হস্তে বিতরণ করছে। এক কথায় বলা যায়, বুনিয়াদি শিক্ষার মতো উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও সরকার গত ৫০ বছর ধরে করদাতা জনগণের টাকায় নির্মিত উচ্চশিক্ষার বিপুল পরিকাঠামোটি 'পিপিপি মডেল' মারফত বেসরকারিকরণের উদ্যোগ নিয়েছে।

বিলগুলির মূল কথা

বিদেশি শিক্ষা সংস্থা সংক্রান্ত বিলটির মূল উদ্দেশ্য হলো যে কোনও মূল্যে শিক্ষাক্ষেত্রে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ নিশ্চিত করা। ছাত্র-শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের শোষণ না করলে, চূড়ান্ত পীড়নমূলক শ্রম-সম্পর্ক তৈরি করতে না পারলে এই বিশ্বায়নের যুগে চট্জলদি মুনাফা করা কার্যত অসম্ভব। তাই এই সব বিলের মাধ্যমে বিদেশি সংস্থাগুলোকে ভারতের শ্রম আইন মতে বেআইনি কাজগুলি করার আইনি ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। দু-একটা উদাহরণ দেওয়া থাক। যেমন শিক্ষার ক্ষেত্রে কর্মচারী, শিক্ষক এবং ছাত্রদের ট্রেড ইউনিয়নের মাধ্যমে সংগঠিত হওয়া বা সংগঠিত করা ভারতীয় নাগরিকদের একটি মৌলিক অধিকার। কিন্তু এই অদ্ভুত আইন ভারতের মাটিতে প্রতিষ্ঠিত বিদেশি শিক্ষাক্ষেত্রে কর্মীদের ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার কেড়ে নিচ্ছে। এখানেই শেষ নয়। শ্রম সংক্রান্ত কোনো বিরোধ উপস্থিত হলে সেই বিরোধ নিষ্পত্তি করার জন্য ভারতের শ্রম আইন ঐ সমস্ত বিদেশি শিক্ষাক্ষেত্রের কর্মীদের জন্য প্রয়োজ্য হবে না। বেআইনি কাজের জন্য ঐসব সংস্থার কর্মীরা ভারতের আদালতে ঐ সব সংস্থার কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে

মামলা পর্যন্ত করতে পারবেন না।

তাহলে ঐ সব বিদেশি সংস্থায় শ্রম-বিরোধ-এর মীমাংসা কীভাবে করা হবে? তার জন্য আসছে শিক্ষা ট্রাইবুনাল বিল। ভারতের শ্রম আইনে, দেওয়ানি এবং ফৌজদারি আইনে কর্মীদের যে সব সুরক্ষা দেওয়া আছে সেগুলোকে নাকচ করে মালিকদের হাতে শাস্তিমূলক যে সব ব্যবস্থার সুপারিশ এই সমস্ত আইনে রয়েছে, সেগুলোকে জড়ো করে এই ট্রাইবুনাল আইন রচিত হয়েছে। ধরা যাক, সংস্থার কর্তৃপক্ষ একজন পেটোয়া শিক্ষককে অঢেল সুবিধে দিলেন (অনেকগুলো ইনক্রিমেন্ট, এক ধাক্কায় তিনটি প্রমোশন, ক্লাস নেওয়ার ভার লাঘব ইত্যাদি) এবং একই রকম সিনিয়রিটি, একই শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও অন্য কয়েকজনকে দিলেন না। এই কাজ ভারতের সংবিধান-বিরোধী এবং ভারতের যেকোনো আদালত এই মামলায় বাকি শিক্ষকদের পক্ষেই রায় দেবেন। কিন্তু ট্রাইবুনাল মতে কর্তৃপক্ষের এই পক্ষপাতিত্ব করার অধিকার রয়েছে এবং ট্রাইবুনাল-এর রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে যাওয়া যাবে না।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে 'দুর্নীতি রোধ সংক্রান্ত বিল'টি নিজেই দুর্নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। আমরা জানি, টাকা নিয়ে পাশ করানো, ভুয়ো ডিগ্রি দেওয়া ইত্যাদি দুর্নীতিতে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি খুবই দক্ষ। কিন্তু দুর্নীতি নিরোধক বিলটি এই সব দুর্নীতি আটকানোর জন্য নয়— বরং শিক্ষায় দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেওয়াই বিলটির উদ্দেশ্য। দু-একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। অনেক টাকার বিনিময়ে ভর্তি হওয়া ছাত্ররা যাতে কিছুতেই অকৃতকার্য না হয় তার জন্য একই প্রশ্নপত্রের ওপর বারবার পরীক্ষা নেওয়া এই আইন মতে দুর্নীতি নয়— সংস্থার আর্থিক লগ্নির সুরক্ষার জন্য সংস্থাটি এই কাজ করতেই পারে!

উচ্চশিক্ষার মূল্যায়নের জন্য নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞদের মতামতই একমাত্র মান্যতা পায়। এই জন্য ভারত সরকার উচ্চশিক্ষায় অ্যাকাডেমিক নজরদারির কাজটি স্বশাসিত সংস্থা 'ন্যাক' মারফত করে আসছিল। কিন্তু ন্যাশনাল অ্যাক্রেডিশন রেগুলেটরি অথরিটি গঠনের জন্য যে নয়া বিলটি আসছে তা কার্যত 'ন্যাক' সংস্থাকে পুরোপুরি অকেজো করে দেবে। নজরদারি ছাড়াও 'ন্যাক' পঠন-পাঠন এবং উচ্চতর গবেষণার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজগুলিতে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিত। প্রস্তাবিত সংস্থাটি এসব কিছুই করবে না। তাদের কাজ কেবল পড়ুয়ারা 'শিক্ষাপণ্য' কেনার জন্য যে টাকা লগ্নি করছে, তারা সেই লগ্নির সমতুল্য পরিমাণ পরিষেবা পাচ্ছে কিনা সেই বিষয়ে পড়ুয়াদের 'আর্থিক পরামর্শ' দেওয়া। এই অথরিটির দেওয়া সার্টিফিকেট-ই এখন থেকে ভারত সরকার গ্রহণ করবে,, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, অল ইন্ডিয়া মেডিক্যাল কাউন্সিল, ইনডিয়ান কাউন্সিল অফ হিস্টরিক্যাল রিসার্চ প্রভৃতি মান্য বৌদ্ধিক সংস্থাগুলির শিক্ষা সংক্রান্ত সার্টিফিকেট এখন থেকে আর গ্রাহ্য হবে না। এই অথরিটিকে এমন ক্ষমতা দেওয়া আছে যে তারা এই 'আর্থিক পরামর্শ' দেওয়ার জন্য আগ্রহী সংস্থাকে সার্টিফিকেট দিতে পারবে এবং তখন এই নতুন করে সার্টিফিকেট পাওয়া সংস্থার কথা ইউজিসি বা ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সের-এর চেয়েও দামি হবে।

উপসংহার

অন্য বিলগুলোর বক্তব্যও একই রকম চমকপ্রদ। ব্রিটিশ আমলে মেকলে সাহেব ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে ব্রিটিশ রাজের সমর্থক তৈরি করতে এবং প্রশাসন চালানোর জন্য 'কালা-সাহেব' তৈরির নিদান দিয়ে ভারতের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থাটিকে একটি উল্টোনো পিরামিডের আকারে গড়ে তোলার সুপারিশ করছিলেন। বুনিয়াদি শিক্ষাকে হাড়িকাঠে চড়িয়ে, সেই স্তর থেকে ভরতুকি তুলে নিয়ে কেরানি-আমলা বানানোর ফ্যাক্টরি খোলার অভিপ্রায়ে তিনি ওপরের স্তরে ভরতুকি দিতে চেয়েছিলেন। এই একই কদর্য কাণ্ডটি ১৯৪৭-এর পরবর্তী 'জাতীয়তাবাদী সরকার'গুলো আরও খোলাখুলি, আরও অশ্লীল এবং আরও হিংস্রভাবে ভারতের আমজনতার ঘাড়ে চাপাতে বদ্ধপরিকর। শিল্পক্ষেত্রে *সেজ* আইন যেমন শ্রমিক শোষণের হাতিয়ার, উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এই বিলগুলি তেমনি বিদ্যাচর্চা পেষণের হাতিয়ার। এখন খোলাখুলি দুটি পক্ষ তৈরি হয়েছে : শ্রেণী-কেন্দ্রিক স্বজাতি-প্রীতির দল আর শোষিতদের স্বজাতি-প্রীতির দল। এদের মধ্যে আসন্ন লড়াইয়ে কার ললাটে জয়মাল্য ঝুলবে তা ইতিহাস ঠিক করবে।

পশ্চিমবঙ্গে গ্রামীণ স্কুলগুলিতে জল, টয়লেট ও মিড-ডে মিল ২০০৯

		শতাংশে
জল :	*নেই*	১২.৯
	ব্যবস্থা আছে, কিন্তু জল নেই	১০.১
	আছে	৭৭
টয়লেট :	*নেই*	৬.১
	আছে, কিন্তু অব্যবহার্য	২২.৩
	ব্যবহারোপযোগী টয়লেট আছে	৭১.৭
	মেয়েদের ব্যবহার্য টয়লেট	৩৯.২
পরিদর্শনের দিন মিড-ডে মিল দেওয়া হয়েছে		৩৬.৬*

**২০০৫ সালে এই সংখ্যাটি ছিল ৭৬.১% আর ২০০৭ সালে ৯৮.৭%*

সূত্র : ASER (www.asercentre.org)

শিক্ষা সংকট

আমাদের প্রাথমিক শিক্ষার ইতিবৃত্ত

সুনন্দ সান্যাল

ভোলা উচিত নয় যে তৃণমূল সরকারের শিক্ষাব্যবস্থার বিগত ৩৪ বছরের দায়ভার নেই। এখন যা ঘটছে তার দায়িত্ব কিন্তু তাকে নিতেই হবে। এতাবৎ যা ঘটছে সেই চিত্রও ভালো নয়। তার উদাহরণ কেন্দ্রীয় মানোন্নয়ন মন্ত্রী কপিল সিবালের কথায় ক্লাস এইট পর্যন্ত পাস ফেল তুলে দেওয়া। যখন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এই সিদ্ধান্ত নিলেন তখন একটি স্কুল কমিটি তার ইন্টারিম রিপোর্ট লিখছিল। এই কমিটির সঙ্গে কোনও পরামর্শ করা হয়েছিল বলে জানি না। কপিল সিবাল এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার কতটা উপযুক্ত, সেই প্রশ্ন তোলা হয়। কিন্তু আমাদের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী কতটা যোগ্য, সে প্রশ্ন কিন্তু কখনও তোলা হয় না।

স্কুলশিক্ষার অন্তর্গত প্রাথমিক স্তরটি দুভাগে বিভক্ত— বুনিয়াদি বা এলিমেন্টারি— যা পঞ্চম শ্রেণী (এ রাজ্যে চতুর্থ শ্রেণী) পর্যন্ত প্রসারিত। আর এ রাজ্যে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত আপার প্রাইমারি। আমরা ১৯৫০ সালে সংবিধান গ্রহণ করার সময় স্থির করি পরবর্তী দশ বছরের (অর্থাৎ ১৯৬০ সাল) মধ্যে ৬ থেকে ১৪ বছরের সবাইকে স্কুলে নিয়ে আসব। সেই কাজ স্বাধীনতার ৬০ বছর পূর্তি পর্যন্ত অবহেলিত হয়ে এসেছে। এই স্তরটি যে মেধাবিকাশের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সে কথা অনেকেই বলেন, কিন্তু করেন না কিছুই। অবশেষে শিক্ষার অধিকার আইন হিসাবে গৃহীত হয়েছে ঠিকই, মিড-ডে মিলও চালু হয়েছে, কিন্তু প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়ে গেছে। তার প্রমাণ এক ঝটকায় প্রাইমারি স্কুলের পাশ- ফেল প্রথা তুলে দেওয়া।

বুনিয়াদি স্তরে মোটামুটি ৫৫০০০ স্কুল আছে বলা হয়ে থাকে। তার মধ্যে কতগুলি যে বাস্তবে আছে তা নিয়ে সন্দেহ আছে। উদাহরণস্বরূপ, মুর্শিদাবাদে মাইলের পর মাইল গিয়েও দেখবেন কোনও বুনিয়াদি প্রাথমিক স্কুল নেই। দক্ষিণ ২৪ পরগণার কানমারিতেও একই চিত্র। এই অবস্থা বহুদিন চলছে। যে কটি নিম্ন বুনিয়াদি স্কুল আছে তাও কী অবস্থায় আছে জানা নেই। অশোক মিত্রের নেতৃত্বে যে কমিশন গঠিত হয়েছিল তার সেক্রেটারিরা খুবই চেষ্টা করেছিলেন নামের একটা তালিকা সংগ্রহ করার জন্য। তার মধ্যে বাছাই করা তিন/চারটি সরেজমিনে গিয়ে সদস্যরা দেখেছিলেন। তার মধ্যে একটিতে গিয়ে দেখা গেল সাত পুরু ধুলো— অর্থাৎ কস্মিন কালে ক্লাস হয় নি। ঘরে অবশ্য একটা তালা লাগানো ছিল, তালাটাও হাত লাগাতেই মুড়মুড় করে ভেঙ্গে গেল।

এই আছে-কিন্তু-নেই স্কুলগুলোর অনেকগুলিতেই ছাত্রছাত্রীদের পৃথক শৌচাগার নেই, কয়েকটিতে একজন শিক্ষক বা শিক্ষিকাও নেই, এইভাবে লেখাপড়ার মান কী হতে পারে? স্টেট কাউন্সিল অফ এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং এবং ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট পরিচালিত একটি সমীক্ষায় দেখা যায় শতকরা ৮০টি ছেলেমেয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত সরল বাংলায় লেখা ম্যালেরিয়া সম্পর্কিত লিফলেট পড়ে মানে বুঝতে পারছে না। এই ধারণাই হয় তার পরের আআইএম এবং প্রতীচী ট্রাস্টের রিপোর্ট পড়লেও।

> **গ্রামের সরকারি স্কুলের প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণীর শিশুদের ৩০ থেকে ৮৮ শতাংশ প্রাইভেট টিউশন নেয়। শুধু তাই নয়, উঁচু ক্লাসে বেসরকারি স্কুলের তুলনায় সরকারি স্কুলের শিশুরাই বেশি প্রাইভেট টিউশন নেয়!**

দ্বাদশ বিধানসভায় একটি শিক্ষা সম্পর্কিত স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন সিপিএমের বিধায়ক পদ্মনিধি ধর। তিনি তাঁর স্বাক্ষরিত রিপোর্টে লেখেন, যতগুলি স্কুল স্থাপনার প্রয়োজন তার জন্য জমিটাও পরবর্তী দশ বছরে সংগ্রহ করা যাবে না। আইআইএমের রিপোর্টে দেখা যায়, চারটি ক্লাসের জন্য যদি একজন করেও শিক্ষক দিতে হয় তা হলে বিদ্যমান স্কুলের দ্বিগুণেরও বেশি স্কুল স্থাপন করতে হবে। তা ছাড়া বিদ্যমান স্কুলগুলিতেও শিক্ষক অপ্রতুল, তার কারণ এই নয় যে স্কুল পিছু মোট নিযুক্ত শিক্ষকের সংখ্যাই কম। আদতে শহরাঞ্চলে অনেক শিক্ষকই থাকতে চান, কারণ সেখানে প্রাইভেট টিউশনি লাভজনক।

তা ছাড়াও বিচিত্র কারণে আমাদের স্কুলগুলোর বিবেচনায় নিচের ক্লাসকে কম গুরুত্বপূর্ণ। ক্লাস ওয়ানে যে ছাত্রছাত্রীরা পড়ে তারা তো কিছুই নয়। আমাদের বিবেচনায় ক্লাস টেনই সবচেয়ে জরুরি। কারণ সেটা উত্তীর্ণ হলেই বাইরের পরীক্ষা বা এক্সটারনাল এক্সামিনেশন। পরীক্ষা দিয়েই যে ক্লাসের গুরুত্ব বিচার এটাই সবচেয়ে বড় কারণ ক্লাস এইট পর্যন্ত বার্ষিক পরীক্ষা না তুলে দেওয়ার। আমরা তো সারা জীবনই পরীক্ষা দিই। ফসল না ফললে ঋণভারে যখন কৃষক অবসন্ন তখনই তার আত্মহত্যার প্রবণতা জাগে। তার জন্য কৃষককে প্রস্তুত করার দায় কি নেই?

আমি ডঃ বিনোদ রায়না এবং ডঃ সুবীর শুক্লাকে কপিল সিবালের প্রতিনিধি ধরে নিচ্ছি। কারণ তাঁরাও সিবাল সাহেবের মতো নতুন কিছু করতে চান। বাঙালিদের মধ্যে কেউ কেউ অবশ্যই তাই চান, তার মধ্যে পড়েন বাঙালির নিজস্ব নোবেল প্রাইজপ্রাপক অমর্ত্য সেনও। আমি প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদের কাছে কৃতজ্ঞ। তাঁরা আমাকে ডঃ শুক্লার মুখোমুখি বসিয়ে দিয়েছিলেন। এটি ছিল সেমিনার, অতএব ঘরভরতি লোক উপস্থিত। অর্থাৎ ক্লাস এইট পর্যন্ত পাস ফেল তুলে দেওয়ার যা আলোচনা হয়েছে তা আমার সামনেই হয়েছে। লুকোবার কিছুই নেই। আমার বিবেচনায় কপিল সিবাল যে প্রস্তাব দিয়েছেন তা মানলে পশ্চিমবঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হবে ক্লাস এইট পর্যন্ত পরীক্ষাব্যবস্থা তুলে দিলে বাংলা-মাধ্যম স্কুলগুলো ক্রমশ উঠে যাবে। সিবাল মহাশয়ের প্রস্তাবটি আইনে রূপান্তরিত হয়েছে, তবু রাজ্য সরকারের এখনও কিছু করার আছে।

সেটা হলো, অ্যাক্ট যখন হয়েই গেছে তখন সিদ্ধান্ত নিতে হবে পরিকাঠামো নির্মাণ করার আগে পরীক্ষা তোলা যাবে না, এবং এই অন্তর্বর্তী সময়টুকু চেষ্টা করে অ্যাক্ট অ্যামেন্ড করতে হবে। তা না হলে বাংলা মাধ্যম স্কুলগুলো শেষ হয়ে যাবে। তাতে সিবাল মশায়দের ক্ষতি নেই। কিন্তু ভারতীয়রা একটি ভারতীয় শিক্ষা-মাধ্যম খোয়াবে। তার যা ক্ষতি সবটুকুই কেবল বাঙালিদের নয়— ভারতীয়দেরও। আমার বিবেচনায় যেখানে সম্ভব সেখানেই মাতৃভাষার মাধ্যমে পড়ানো উচিত। সেটাই কার্যত কোঠারি কমিশনের সুপারিশ। অবশ্য ঠিকই, ইংরেজিই হলো উচ্চ শিক্ষার মাধ্যম— তাকে অবহেলা রবীন্দ্রনাথও করেননি। কিন্তু যেখানে সম্ভব সেখানেই মাতৃভাষা মাধ্যমে স্কুলশিক্ষা দেওয়া উচিত— অন্য কারণে না হলেও অন্তত এটা বোঝাতে যে কোনও ভাষাই মাতৃভাষীদের সব ভাষিক চাহিদাই মিটিয়ে দিতে পারে।

> গ্রামের চতুর্থ শ্রেণীর শিশুদের এক-চতুর্থাংশের বেশি ছোট ছোট সহজ বাংলা বাক্যও পড়তে পারে না। তৃতীয় শ্রেণীর শিশুদের ক্ষেত্রে সংখ্যাটা মোট শিশুদের অর্ধেক।

রাজীব গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর *দ্য চ্যালেঞ্জ অব এডুকেশন* নামের একটি বই নরসিমহা রাওয়ের মানবোন্নয়ন দপ্তর থেকে বিপুল সংখ্যায় সারা দেশেই প্রচারিত হয়। দেশজুড়ে আলোচিত হওয়ার পর তার অংশবিশেষ গৃহীত হয়। আমি কপিল সিবালকে কি জিজ্ঞাসা করতে পারি, এত দিনের পুরনো পরীক্ষাব্যবস্থা তুলে দেওয়ার আগে সেই জাতীয় বিতর্কের ব্যবস্থা করা হলো না কেন? আমার বিশ্বাস, জনমত সমীক্ষা করলে দেখা যেত, দেশজুড়ে পিতামাতারই পরীক্ষাব্যবস্থা তুলে দেওয়ার বিরুদ্ধে সোচ্চার হচ্ছেন। 'বিল' হিসাবে কত কী-ই সংসদে পেশ করা হয়। কজন পিতামাতা আর তার খবর রাখেন? সংখ্যাগুরু দেশবাসীই তা বিবেচনার মধ্যে আনেন না। অ্যাক্ট হওয়ার পরে নিজে আইনের প্যাঁচে পড়লে তার খেয়াল হয়। আমার মনে হয়, কেন্দ্রীয় মন্ত্রক আমজনতার এই অজ্ঞতার সুযোগ নিয়েছে।

ক্লাস এইট পর্যন্ত 'নো ডিটেনশন' প্রথা চালু করলে পরীক্ষা-নিয়ন্ত্রিত স্কুলব্যবস্থার একটা মস্ত দায়বদ্ধতা অস্বীকার করা হবে। জীবনে যা ঘটবে, ঘটতে পারে, তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে বিধিবদ্ধ স্কুলব্যবস্থা দায়বদ্ধ। এর পর যে কোনও কারণে— উদাহরণস্বরূপ ফসলের যদি ক্ষতি হয় তা হলে চাষী আত্মহত্যা করলে— কী করবেন? স্কুলব্যবস্থা কি সব শিক্ষার্থীকে ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়িয়েও আত্মহত্যাকারীকে নিরস্ত করার চেষ্টা করবে না? তা ছাড়া, মন্ত্রী তো শেষ বিচারে ভারতীয় নাগরিক। আমিও তাই। মন্ত্রী হিসাবে সিবাল সাহেব সব নাগরিকের অধিকার রক্ষা করতে দায়বদ্ধ। ভারতীয় নাগরিক হিসাবে আমার স্থান কারও নিচে নয়। কোনও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বা তাঁর পারিষদরা আমার ওপর কোনও সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে পারেন না। তিনি কোন্ যুক্তিতে শতাধিক বছরের পুরোনো পরীক্ষাব্যবস্থা তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন? স্পষ্টতই তিনি আমাদের— এমনকি বাপমায়েদেরও— অধিকার খর্ব করছেন। তিনি একটা গোষ্ঠীবিশেষের পরামর্শে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত না নিয়ে তিনি কাজটা করতে পারেন না। সেই জন্যই অ্যাক্টটা অ্যামেন্ড করার দাবি জানাচ্ছি। ডঃ বিনোদ রায়নার মতে ক্লাস এইট পর্যন্ত পরীক্ষা চলতে থাকলে ছেলেমেয়েদের আত্মহত্যার প্রবণতা বাড়বে। কিন্তু কিছু ছেলেমেয়ে তো পরীক্ষা দিতে ভালোওবাসে। কেনই বা আমরা ধরে নিচ্ছি, যে সব পরামর্শ বিভিন্ন রাজ্যের সিলেবাস কমিটি বা ওই জাতীয় কমিটি তাদের সরকারকে দেবে, তা কার্যকর করলেও পঠনপাঠনের কোনও উন্নতি হবে না? তার জন্য আত্মহত্যার প্রবণতা একটুও কমবে না? ঠিকই, কিছু ছেলেমেয়ে পরীক্ষায় খারাপ করলে আত্মহত্যা করে। তার জন্য মানসিক দুর্বলতা দায়ী। তার জন্যও প্রস্তুত করার কি বিধিবদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থা করবে না? তাছাড়া, পশ্চিমবঙ্গে পরীক্ষা সম্পর্কিত কারণে কতজন আত্মহত্যা করে, জানেন কি? সারা ভারত জুড়ে বড়ো জোর এক শতাংশ পরীক্ষার্থী। ব্যতিক্রমী ঘটনা বলেই তা মিডিয়া প্রকাশ করে। তা ছাড়াও, কপিল সিবাল বা তাঁর পরামর্শদাতা গোষ্ঠী খবর নিয়ে দেখতে পারেন— ক'জন প্রথম প্রজন্মের শিশু পরীক্ষায় ব্যর্থতার জন্য আত্মহত্যা করেছে, আর ক'জন পরীক্ষাজনিত কারণে অষ্টম শ্রেণীর পর আত্মহত্যা করেছে। কপিল সিবাল মশায়ের কাছে জিজ্ঞাসা, যদি দেখেন আত্মহত্যাকারীদের মধ্যে বেশিরভাগই ক্লাস এইটের পর ঘটেছে,

তাহলেও কি পরীক্ষা তুলে দেবেন?

পূর্বতন সরকার ১৯৭৭ সালে ক্ষমতায় এসে ভেবেছিল, ১৯৮২ সালের মধ্যে সব শিশুকে স্কুলে নিয়ে আসবে। ফেল করলে স্কুলছুট বেড়ে যাবে ধরে নিয়ে ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত ইংরেজি পঠনপাঠন বন্ধ করে দিয়েছিল এবং ক্লাস ফোর পর্যন্ত পাশ ফেল তুলে দিয়েছিল। ইংরেজির কথা এর পরেই বলছি। কিন্তু পাশ ফেল তুলে দেওয়ার ভয়ঙ্কর পরিণতি কী হয়েছে জানেন নিশ্চয়! স্কুলে ঢোকার দু-আড়াই বছর পরে একটা পরীক্ষার ব্যবস্থা বামফ্রন্ট সরকার শেষ পর্যন্ত করেছিল ঠিকই, কিন্তু তার ফলাফল ক্ষমতা থেকে অপসারিত হওয়ার আগে পর্যন্ত বের করতে পারেনি। তাও মেনেছি। কিন্তু শেষের পরীক্ষার (অ্যানুয়াল এগজামিনেশন) অসাফল্য মানছি না, মানব না। কেন? আমরা জানি, প্রথম প্রজন্মের শিশুরা পিতামাতার সঙ্গে কাজ করার জন্য কেউ কেউ স্কুলে আসবেই না— মিড-ডে মিল খেতেও নয়। কারণ তাদের মাঠে কাজ করা অনেক বেশি লাভজনক, তা ছাড়া ৪ মাস শিক্ষকের কাছে পড়ে যদি একবছরের কাজ সেরে ফেলা যায়, তাহলে কেন মিড-ডে মিল খেতে ছেলেমেয়েরা বাকি কদিন আসবে?

ডঃ রায়না রবীন্দ্রনাথের কথা তুলেছিলেন। ঠিকই, রবীন্দ্রনাথ পরীক্ষাকে দানবের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। কিন্তু তার পরেও তিনি 'এত উজানে নৌকা বাওয়া সম্ভব নয় বলে পাঠভবনকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। আর সমস্ত ব্যবস্থা অপরিবর্তিত রেখে 'এত উজানে' নৌকা বাওয়ার কথা বলছি। তা ছাড়াও, এটা ঠিক, ন্যাশনাল কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক নামক চমৎকার নথিটি আরটিই মেনে তৈরি হয়েছে। কিন্তু এনসিএফ অ্যাডাপ্ট করতে বলেছে— বলেনি অ্যাডাপ্ট করতে। কাজেই, ধরে নিতে পারি, যে রাজ্যে বাবা-মা চান পরীক্ষা যেমন আছে তেমনই থাকুক সেখানে পরীক্ষা চালানো যেতে পারে। কিন্তু ডঃ বিনোদ রায়না তেমন তো বললেন না, বরং এমন ভাব দেখালেন যেন আমাদের মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

আমি ডঃ রায়নাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম : (১) আপনারা কি পরিকাঠামো তৈরি হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে রাজি? (২) আপনারা কি পিতামাতাকে রাজি করানোর জন্য সময় দিতে প্রস্তুত? প্রথম প্রশ্নের উত্তরে ডঃ রায়না কী বলেছিলেন মনে নেই। পরীক্ষা নেওয়ার পক্ষে সেটা ওকালতি ছিল না। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে ডঃ রায়না বলেন, পরীক্ষাব্যবস্থা বরপণের চেয়েও খারাপ। এটা কি উত্তর হলো? উনি তো আরও কঠোর হয়ে খুন হয়ে গিয়ে কঙ্কাল হয়ে যাওয়ার কথাও বলতে পারতেন— বলতেন পারতে এ রাজ্যের আকছার ঘটা ধর্ষণের কথা। দুটি বিসদৃশ বস্তুকে কী করে সমীকৃত করা যায়?

অজুহাত হিসাবে আরও একটা (কু)যুক্তি দেওয়া হচ্ছে। পরীক্ষাব্যবস্থা তুলে দেওয়ার সমর্থকরা বলছেন, উন্নত দেশে দেখা যাচ্ছে পরীক্ষা না থাকলেও ছেলেমেয়েরা দিব্বি শিখছে। উন্নত দেশ আর উন্নতিকামী দেশের মধ্যে কিন্তু কোনও তুলনাই চলে না। উন্নত দেশে কোনো ক্লাসে কোনো বিষয়ে যে সব ছাত্রছাত্রীরা মান নিচু থাকে, পরের ক্লাসে সে বিষয়ে তাকে আলাদাভাবে শেখানো হয়। তাছাড়া, টিভি, ভিডিও ইত্যাদি যন্ত্রপাতি সহযোগে পড়ানো হয়ে থাকে। কিন্তু অনেকেরই অভিজ্ঞতা আছে, একটি অত্যল্প দামী টেপরেকর্ডারও স্কুলকে দিলে সেটির সম্ভাবনা থাকে হেডস্যারের বাড়ি চলে যাওয়ার।

পশ্চিমবঙ্গে গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন শ্রেণীর কত শতাংশ ছাত্রছাত্রী সহজ বাংলা পড়তে পারে (২০০৯)

শ্রেণী	*একেবারে পারে না*	*শুধু অক্ষর চেনে*	*শব্দ পড়তে পারে*	*বাক্য পড়তে পারে*		*সর্বমোট*
				*প্রথম শ্রেণীর বই**	*দ্বিতীয় শ্রেণীর বই***	
প্রথম শ্রেণী	২৩	৪৪.৪	২১.২	৮.৩	৩.১	১০০
দ্বিতীয় শ্রেণী	৮.৫	৩৩.৭	২৮.৩	১৯.৮	৯.৭	১০০
তৃতীয় শ্রেণী	৪.৬	১৯.২	২৫.৩	২৮.৯	২২.১	১০০
চতুর্থ শ্রেণী	১.৭	৮.৭	১৮.৭	৩৪.৪	৩৬.৫	১০০
পঞ্চম শ্রেণী	১.৭	৬.২	১২.৬	৩৩.৪	৪৬	১০০
ষষ্ঠ শ্রেণী	০.৬	২.৫	৬.৫	২৬.৭	৬৩.৭	১০০
সপ্তম শ্রেণী	০.২	১.৪	৪.২	১৮.৯	৭৫.৩	১০০
অষ্টম শ্রেণী	০.৩	০.৯	১.৯	১২.৯	৮৪.১	১০০

** ছোট ছোট বাক্য** লম্বা লেখা*

সূত্র : ASER (www.asercentre.org)

Unfiled Notes Page 26

সরকারি স্কুলই একমাত্র বিকল্প

সংগ্রাম মুখার্জী

এই রাজু, আয় খেলবি না?

খেলতেই তো চায় রাজু, শুধু কি খেলা? সে তো পড়তেও চায়। কিন্তু হঠাৎ যে তার বাবার কী হল, বারো দিনের জ্বর, গ্রামের ডাক্তারবাবু এলেন, দামি দামি ওষুধ খেতে বললেন, কিন্তু জ্বর কমলো না। সংসারের মাথা ছিলেন রাজুর বাবা। কোনোজিন রাজু বা তার মাকে অর্থোপার্জনের কথা চিন্তা করতে হয়নি। কিন্তু বাবা মারা যাওয়ার পর মা অন্যের বাড়িতে কাজ শুরু করলেন, সে টাকাতে সংসার চলে না। বাবার অসুখের সময় যে টাকা ধার করা হয়েছিল তা আজও শোধ করা যায়নি। তাই রাজু তার পাড়ার কাকার কথা ফেলতে পারেনি। তার বন্ধুরা রোজ টিফিনের সময় তার কাছে আইসক্রীম কিনতে আসে আর অবিরাম পিড়াপিড়ি করে— আয় না রাজু, খেলবি আয়। হঠাৎই রাজুর খেলার দিন, পড়ার দিন শেষ হয়ে যায়।

স্কুল ছুটির সময় তার প্রিয় স্যার তার কাঁধে হাত রেখে বলেন— হ্যাঁরে রাজু, কিছু ব্যবস্থা হল? তোর পড়াশুনো ছেড়ে দেওয়াটা আমি যে কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না।

রাজু মনে মনে বলে, ব্যবস্থাই তো করেছি, রোজ ২০ টাকা রোজগার করছি।

মা প্রতিদিন সকালবেলা চোখের জল মুছতে মুছতে কাজে যায়— রাজুও মায়ের সাথে বেরিয়ে পড়ে— মর্নিং স্কুল চলছে যে।

রাজুর মাস্টারমশাই রাজুর এই অসময় পড়াশুনা ছেড়ে দেওয়াটা মেনে নেবেনই বা কী করে? তিনি জানেন তার ছাত্র প্রতিভার নিরিখে যে কোন শহুরে অবস্থাপন্ন ঘরের বাচ্চার চেয়ে কোনও অংশে কম নয়। শুধু সুযোগের অভাব, আর সেই সুযোগ করে দেওয়ার জন্য তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত। মাস্টারমশাইয়ের মনে হয়, রাজুর লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়ার জন্য কি শিক্ষার 'বিনামূল্য' হওয়াটাই যথেষ্ট? রাজুর জন্য শিক্ষা কি সত্যিই 'বাধ্যতামূলক' হতে পারে?

রাজুর নিজের অসীম আগ্রহ এবং তার মাস্টারমশাইয়ের অবিশ্রান্ত প্রয়াস রাজুকে আবার তার প্রিয় বন্ধু, প্রিয় শিক্ষক, প্রিয় স্কুলের নিরাপদ আঙিনায় পৌঁছে দিয়েছে। যদিও এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের সব শিশু তার মতন ভাগ্যবান নয়, তবুও পশ্চিমবঙ্গের তেষট্টি হাজার সরকারি বিদ্যালয়ে এক কোটি পঞ্চান্ন লক্ষ শিশু, কিশোর-কিশোরী পড়ছে, লিখছে, খেলছে, হাসছে, কেউ বা কাঁদছে। তাদের অনেকেই যেমন বেসরকারি স্কুলের পরিধির বাইরে থাকে, তেমনি অনেকেই পড়াশুনোর জন্য বাড়তি খরচ চালানোয় অসমর্থ। এই বিশাল আয়োজনে সব স্কুল সমান নয়, আবার সব মাস্টারমশাই দিদিমণিরাও সমানভাবে প্রয়াসী নন। তবে এ বিষয়ে দ্বিমত রাখা সম্ভব নয় যে আমাদের সমাজে রাজুদের শিক্ষার ব্যবস্থাপনা একমাত্র সরকারি বিদ্যালয়েই সম্ভব এবং সেক্ষেত্রে গত দশকে বেশ কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে। যেখানে বেসরকারি বিদ্যালয়গুলি শহরকেন্দ্রিক হয়ে উঠছে, সেখানে সরকারি বিদ্যালয়গুলি গ্রামীণ, পিছিয়ে পড়া, আপাতদৃষ্টিতে বঞ্চিত সমুদায়গুলির মধ্যে শিক্ষার প্রসারে নিয়োজিত। উত্তরবঙ্গের ছ'টি জেলায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সর্বশিক্ষা অভিযানের সহযোগিতায় প্রতীচী ইনস্টিট্যুটের সমীক্ষায় এইরকমই তথ্য উঠে এসেছে। যেখানে সব মিলিয়ে রাজ্যের ১৫ শতাংশ বিদ্যালয়গুলি শহরাঞ্চলে অবস্থিত, সেখানে সরকারি বিদ্যালয়গুলির মাত্র ৫ শতাংশ শহর এলাকায়, অর্থাৎ ৯৫ শতাংশই গ্রামীণ এলাকায়। সরকারি স্কুলগুলি যেখানে সর্বজনীন শিক্ষার উদ্দেশ্যে কাজ করছে, সেখানেই বেসরকারি বিদ্যালয়গুলি শহুরে মধ্যবিত্ত সমাজের শিশুদের মোটা মাইনের বিনিময়ে শিক্ষাকে বাণিজ্যিক পণ্যে পরিণত করছে। শুধু তাই নয়, সরকারি বিদ্যালয়গুলিতে অনুন্নত শ্রেণীর বাচ্চাদের সংখ্যা অন্য সম্প্রদায়ের বাচ্চাদের তুলনায় অনেক বেশি। *Dise* (District Information System of Education) 2010-11 পরিসংখ্যান অনুযায়ী উত্তরবঙ্গের সরকারি বিদ্যালয়গুলিতে যেখানে তপশিলী জাতি, আদিবাসী এবং মুসলমান বাচ্চাদের সংখ্যা ৮৫ শতাংশ, সেখানে ২০০১ সালের জনগণনার হিসেব বলে যে এই এলাকায় এঁদের জনসংখ্যা ছিল ৭৩ শতাংশ, অর্থাৎ জনসংখ্যার অনুপাতে সরকারি বিদ্যালয়গুলিতে এই তিন সম্প্রদায়ের বাচ্চাদের ভর্তি অনেকটাই বেশি।

নিঃসন্দেহে এ বিষয়ে সরকারি বিদ্যালয়গুলির অবদান অনস্বীকার্য। কিন্তু, এগুলির মধ্যে নানান তারতম্য, এবং এদের কাজে উন্নতির অবকাশ অনেক। বিনামূল্যে বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯ দ্ব্যর্থহীন ভাবে বিদ্যালয়-প্রতি শিক্ষকের সংখ্যার হিসেবটি কষে দিয়েছে। আইন বলে, প্রতি ৩০টি শিশুর

এই লেখাটিতে ব্যবহৃত তথ্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সর্বশিক্ষা মিশনের সহায়তায় প্রতীচী ইনস্টিট্যুট এর কাজ Evaluation Support for the Implementation of Sarva Sikha Mission in North Bengal Districts থেকে নেওয়া। সর্বশিক্ষা মিশনের রাজ্য প্রকল্প আধিকারিক সহ অন্যান্য কর্তৃপক্ষের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। এই কাজটিতে প্রতীচী ইনস্টিট্যুটের পক্ষ থেকে যুক্ত ছিলেন—প্রণবেশ মাইতি, মুখলেসুর রহমান গাইন, সুস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তোয়া বাগচী এবং শুভ্রা দাস, এঁদের প্রত্যেকের কাছে আমি ঋণী। প্রতীচী ইনস্টিট্যুটের সহকর্মীদের মতামত ও উৎসাহ আমাকে সমৃদ্ধ করেছে। তাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা। মতামত ব্যক্তিগত।

জন্য একজন শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। যদি বিদ্যালয়ে শিশুর সংখ্যা ২০০-র বেশি হয়, সেক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষক বাদে প্রতি ৪০টি শিশুর জন্য একজন শিক্ষক প্রয়োজন। প্রতিটি শিক্ষকের জন্য একটি শ্রেণীকক্ষ বরাদ্দ করতে হবে। সে তুলনায় গ্রামীণ এলাকায় বিদ্যালয়গুলির পরিকাঠামোগত অভাব শহরের বিদ্যালয়গুলির তুলনায় অনেকটাই বেশি। উত্তরবঙ্গের সরকারি বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯ অনুযায়ী বর্তমান শিক্ষকের সংখ্যার হিসেবে দেখা যায়— যেখানে শহুরে বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষকের অভাব ৯ শতাংশ, সেখানে গ্রামীণ বিদ্যালয়গুলিতে ২১ শতাংশ। একইরকম ভাবে শহুরে বিদ্যালয়গুলিতে শ্রেণীকক্ষের অভাব ২১ শতাংশ, গ্রামীণ বিদ্যালয়গুলিতে তা ৪৫ শতাংশ।

শহরের তুলনায় গ্রামের বিদ্যালয়গুলিতে পাঠরত শিশুর সংখ্যাও অনেকটা বেশি। শহরে যেখানে ৫২ শতাংশ বিদ্যালয়ে শিশুর সংখ্যা ৯০ অথবা তার কম, গ্রামীণ অঞ্চলে এইরকম বিদ্যালয় মাত্র ৪১ শতাংশ। শিশুসংখ্যার বিচারে ছোট বিদ্যালয়গুলির পরিচালনা অনেক বেশি সহজ এবং ফলপ্রসূ। যে জেলাগুলিতে বিদ্যালয়-প্রতি শিশুদের গড় সংখ্যা কম, সে জেলাগুলিতে সাক্ষরতার হার বেশি। পরিসংখ্যান এ-ও বলে যে শিক্ষক এবং শ্রেণীকক্ষের বণ্টনেও অসামঞ্জস্য আছে। গোটা উত্তরবঙ্গে যেখানে ৫১ শতাংশ বিদ্যালয়ে শিক্ষকের অভাব আছে, সেখানে প্রায় ৩১ শতাংশ বিদ্যালয়ে প্রয়োজনের অতিরিক্ত শিক্ষক নিযুক্ত আছেন। মাত্র ১৮ শতাংশ বিদ্যালয়ে শিক্ষকের সংখ্যা শিক্ষার অধিকার আইনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এই অবস্থার কারণ যেমন শিক্ষকের অভাব, তেমনি তাদের বণ্টনের বৈষম্যও অনেক ক্ষেত্রে প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়ায়। গোটা উত্তরবঙ্গে মোট শিক্ষকের অভাব, উপলব্ধ শিক্ষকের মাত্র ১৮ শতাংশ। জেলাভিত্তিক পরিসংখ্যান দেখলে দেখা যায়, যে জেলাগুলি সাক্ষরতার হারে সব থেকে পিছিয়ে— যেমন উত্তর দিনাজপুর ও মালদা— সেখানেই বণ্টনের বৈষম্য সর্বাধিক। এই দুটি জেলায় বর্তমানে পর্যায়ক্রমে ৬৫ এবং ৬৩ শতাংশ বিদ্যালয়ে শিক্ষকের অভাব আছে। পরিকাঠামোর বণ্টনের বৈষ্যমের আরেকটি সম্পর্ক আছে মোট ছাত্রের সংখ্যার সাথে। মোট ছাত্র সংখ্যার সাথে এই অভাব বাড়তে থাকে। যে বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রের সংখ্যা ৬০ অথবা তার চেয়ে কম, সেখানে প্রতি শিক্ষক গড় ছাত্রের সংখ্যা মাত্র ১৮; ৬১ থেকে ৯০ জন ছাত্রবিশিষ্ট বিদ্যালয়গুলিতে তা দাঁড়ায় ২৭; যে বিদ্যালয়ে ৯১ থেকে ১২০ ছাত্র আছে সেখানে ৩৭; ১৫১ থেকে ২০০ ছাত্রসংখ্যা হলে ৪৪ এবং ২০০-র অধিক ছাত্রবিশিষ্ট বিদ্যালয়গুলিতে ৫৯। সাধারণত শিশুর অভিভাবকরা তাদের ভাল বিদ্যালয়ে পড়াতে চান, সেই প্রয়াসে দেখা যায় তারা নিকটবর্তী বিদ্যালয় এড়িয়ে দূরের বিদ্যালয়ে সন্তানকে ভর্তি করেন। এই ভাল বিদ্যালয়গুলিতে ক্ষমতার বেশি শিশু ভর্তি হয়, কিন্তু সেই হারে শিক্ষকের অথবা শ্রেণীকক্ষের সংখ্যা বাড়ানো সম্ভব হয়ে ওঠেনা। অচিরেই সেই ভাল বিদ্যালয়গুলির শিক্ষার মান পড়তে থাকে। অবশেষে ভাল বিদ্যালয় খারাপে পরিণত হয়। শ্রেণীকক্ষের অভাব শিক্ষকের অভাবের চেয়েও বেশি। উত্তরবঙ্গের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে শ্রেণীকক্ষের সংখ্যা শিক্ষকের সংখ্যার থেকে ২০ শতাংশ কম। আবার আমাদের সমীক্ষকরা ৮৮টি বিদ্যালয় পরিদর্শন করে ৪৪ শতাংশ বিদ্যালয়ে অব্যবহৃত শ্রেণীকক্ষের সন্ধান পান। বিদ্যালয় প্রতি এই রকম অব্যহৃত শ্রেণীকক্ষের সংখ্যা প্রায়শ একটি বা দুটি যা বিদ্যালয়ে পঠনকক্ষ অথবা বিজ্ঞান কক্ষে রূপান্তরিত করলে শিশুদের পড়ার প্রতি আগ্রহ বাড়ে অথবা দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে বিজ্ঞানের যোগগুলি অনুভব করতে পারে। এ বিষয়ে বীরভূম জেলায় শিশুদের বই পড়ার উৎসবের উল্লেখ করা যায়, যেখানে আমরা শিশুদের পড়ার আগ্রহ দেখে অবাক হয়েছি। *Dise*-র পরিসংখ্যান শিশুভর্তি, শিক্ষকের সংখ্যা এবং শ্রেণিকক্ষের সংখ্যাসহ অন্যান্য পরিকাঠামোগত তথ্যের জন্য যেমন অপরিহার্য, এই সব সংস্থানগুলির প্রকৃত ব্যবহার এবং তার অভ্যন্তরীণ সম্পর্কগুলি বিদ্যালয় পরিচালনাকে শুধু প্রভাবিতই করে না, নিয়ন্ত্রণও করে। বিদ্যালয় ছাড়িয়ে গ্রাম এবং গ্রামের পরিবারগুলির মধ্যে ছড়িয়ে যায়। সম্পর্কগুলির যোগ স্থানীয় এবং রাজ্য রাজনীতির সাথে, সমাজের সাথেও থাকে। এই যোগাযোগগুলি বোঝার জন্য শুধু পরিসংখ্যানের দ্বারস্থ হলে চলে না। মিশতে হয় সেই সমাজে।

পশ্চিমবঙ্গের গ্রামের সরকারি স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীর মাত্র ৩০ শতাংশ ভাগ করতে পারে। ৩৫ শতাংশ শিশু শুধুমাত্র সংখ্যা চিনতে শিখেছে। এমনকি, অষ্টম শ্রেণীর এক-চতুর্থাংশ শিশু ভাগ পারে না।

এই সম্পর্কগুলির অবস্থান এবং বিস্তার বুঝবার জন্য একটি সমীক্ষকদল ৮৮টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১২২২টি পরিবার ও প্রতিটি জেলার শিক্ষা বিভাগের বহু আধিকারিকদের সঙ্গে দেখা করে। প্রয়োজনে পরিবারগুলিতে একাধিকবার যাওয়া হয়। প্রতিটি জেলায় একটি করে অভিভাবক-শিক্ষক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। বেশ কিছু ক্ষেত্রে শিশুদের সান্ধ্য রুটিন জানতে গ্রামে রাত্রিযাপন করা হয়। এই কাজটি করবার সময় সমীক্ষকরা বহু ঘটনার সাক্ষী হয়েছেন যা শুধুই আকর্ষণীয় নয়,

অসামান্যও বটে।

যে বিষয়গুলি মূলত শিক্ষাব্যবস্থাকে প্রভাবিত করছে তার মধ্যে অন্যতম হল দূরত্ব। শুধু স্কুল থেকে ছাত্রছাত্রীর বাসস্থানের দূরত্ব নয়, শিক্ষকের বাসস্থান থেকে স্কুলের দূরত্বও স্কুলের পরিচালনাকে প্রভাবিত করে। শিক্ষকের বাসস্থানের দূরত্ব বেশি হলে যেমন তাঁর আসা যাওয়ার অসুবিধে হয়, তেমনি তাঁর সময়ানুবর্তিতাও প্রভাবিত হয়। এ ক্ষেত্রে একথা বলা বাহুল্য হবে না যে, বেশিরভাগ শিক্ষকই শহরের বাসিন্দা এবং সেক্ষেত্রে এই অসুবিধে প্রায় সব স্কুলেই দেখা যায়। শহরের স্কুলগুলিতে শিক্ষকদের বাসস্থান থেকে স্কুলের গড় দূরত্ব ২ কিলোমিটার হলে গ্রামীণ স্কুলের জন্য তা ১৫ কিলোমিটার। নিঃসন্দেহে এতটা পথ অতিক্রম করার পর তাঁর তৎপরতা কিছুটা প্রভাবিত হতে বাধ্য। দ্বিতীয়ত, স্কুলের অন্যান্য দায়িত্বগুলি পালন করা তাঁর কাছে অসুবিধাজনক মনে হয়। বহু অভিভাবক স্কুল চলাকালীন মিটিংগুলিতে আসতে পাবেন না, কারণ সেসময় তাঁরাও কাজে ব্যস্ত থাকেন। দূরত্বের কারণে শিক্ষকরা গ্রামীণ স্কুলগুলিতে কাজ করতে অপছন্দ করেন, বিশেষ করে শিক্ষিকাদের কাছে প্রতিদিনের যাতায়াত মোটেই পছন্দের নয়। সমীক্ষায় তার প্রমাণও পাওয়া যায়— শহুরে এলাকায় স্কুল প্রতি শিক্ষিকার সংখ্যা গ্রামীণ স্কুলের তুলনায় দ্বিগুণের বেশি। শিক্ষিকার অভাবে বিশেষ করে ছাত্রীদের অসুবিধে হয়, যা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়।

বাস্তবিক দূরত্বের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হল শিক্ষক-ছাত্রের সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং ভাষাগত দূরত্ব। সরকারি স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে গরিব, শ্রমজীবী পরিবারের শিশুদের সংখ্যাই বেশি। তাদের সাথে শহুরে বিত্তসম্পন্ন পরিবারের থেকে আসা শিক্ষকদের মধ্যে এক দুর্লঙ্ঘ ব্যবধান কিছুতেই কমানো যায় না। শিক্ষকদের বৃহদাংশ এইরকম সুযোগবঞ্চিত শিশুদের 'প্রথম প্রজন্মের পড়ুয়া' আখ্যান দিয়ে তাদের শিক্ষাগত সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করে দেন। মিড-ডে মিলের সাফল্যকে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে পরিপন্থী বলে চিহ্নিত করেন। তাদের মতে, শিশুরা স্কুলে পড়াশুনোর থেকে খাওয়াকেই বেশি প্রাধান্য দেয়। তাঁরা এই শিশুদের ক্ষুধার তীব্রতা কোনদিন অনুভব করেননি। তাঁরা তাই অভুক্ত শিশুদের মিড-ডে মিলের জন্য সাময়িক অন্যমনস্কতাকে শিক্ষাগ্রহণে অনিচ্ছা বলে মনে করেন। অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষকরা প্রাথমিক শিক্ষায় পাস-ফেল তুলে দেওয়াকে শিশুদের শিক্ষাগত যোগত্য হ্রাসের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেন, কিন্তু যে শিশু পিছিয়ে পড়েছে তাদের অতিরিক্ত যত্ন নেওয়ার কথা তাঁরা অনেক সময়ই ভুলে যান। প্রসঙ্গত একটি ঘটনার উল্লেখ করা যায়। দার্জিলিং জেলায় চতুর্থ শ্রেণীর একটি ছাত্র, লিখতে এবং পড়তে পারে না, শিক্ষকের কাছে কারণ জানতে চাওয়ায় তিনি শিশুটির পারিবারিক অবস্থার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিলেন, শিশুটির কাছে অসফলতার কারণ হিসেবে তিনি তার বাবা-মায়ের বিবাহবিচ্ছেদের ঘটনারও উল্লেখ করলেন। শিশুটির নিজের নামটিও লিখতে পারছিল না। সমীক্ষক তাকে তার নাম লেখা শিখিয়ে দিলেন, সে তা আধ ঘণ্টায় রপ্ত করে নিল, এবং কোন সাহায্য ছাড়াই সে তার নাম লিখতে সক্ষম হল। এই ঘটনা যেমন সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের স্থানীয় সমাজের সাথে গভীর সম্পর্ক রক্ষার উদাহরণ, তেমনি ছাত্রের প্রতি তাঁর অবহেলার নিদর্শন। এইরকম শিশুদের যারা দীর্ঘ তিন চার বছর পড়াশুনোর পরও লিখতে পড়তে পারে না— তাদের আলাদা করে সময় দেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। সমীক্ষা চলাকালীন তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীর প্রায় ৪ শতাংশ শিশু পাওয়া যায় যারা লিখতে ও পড়তে পারে না, যা নিশ্চয়ই সর্বজনীন শিক্ষার পরিপন্থী। শিক্ষকরা যেখানে শিশুদের বেসরকারি স্কুলে ভর্তি ও প্রাইভেট ট্যুশন পড়া সমর্থন করেন না, সেখানে অভিভাবকরা মনে করেন তাদের সন্তানের শিক্ষার জন্য তা অপরিহার্য, যা আর কিছু প্রমাণ করুক নাই করুক, এটা প্রমাণ করে যে অভিভাবকরা তাদের সন্তানের পড়াশুনোর প্রতি সচেতন, অথচ শিক্ষকদের মতে অভিভাবকদের অসচেতনতাই শিশুদের পড়াশুনার ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় হয়ে উঠেছে।

দ্বিতীয়ত, শিক্ষক-ছাত্রের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থানের অসাম্য তাদের একসাথে কাজ করতে বাধা দেয়। গ্রাম শিক্ষা কমিটি অথবা School Level Monitoring Committee (SLMC)-র মিটিং প্রায়শই হয় না, তার জন্য অভিভাবক এবং শিক্ষকরা একে অপরকে দোষারোপ করেন। এ ধরনের মিটিং হলেও তাতে বাচ্চাদের শিক্ষার মানোন্নয়ন নিয়ে খুব একটা আলোচনা হয় না। মিড-ডে-মিল রান্নার বরাত কে পাবে, স্কুল ইউনিফর্ম ও অন্যান্য সুবিধার বণ্টন কী হবে, এগুলি আলোচিত

সরকারি ও বেসরকারি স্কুলের বিভিন্ন শ্রেণীর কত শতাংশ ছাত্রছাত্রী টিউশন পড়ে (২০০৭ ও ২০০৯)

২০০৭	সরকারি		৩০.৬	৪৫.৬	৬৩	৭৪	৮৩.৩	৮৪.৯	৮৩.৭
৮৮.৫	বেসরকারি	৪০.৫	৫৪.৯	৫৯.৫	৬৭	৬২.৭	৬৮.৬	৭৫.৬	৮৯.৭
২০০৯	সরকারি		৫১.৫	৬৩.৯	৬৮.৭	৭৪.২	৭৫.৬	৮০.৮	৮৫.৭
৮৬.৬	বেসরকারি	৬৩.৯	৭১.৪	৭৪.৪	৮৩.৬	৮৭.৭	৭৯.২	৭৮.৯	৭১.২

সূত্র : ASER (www.asercentre.org)

হয়। আবার যে স্কুলগুলিতে শিক্ষকরা তাদের নিজস্ব সামাজিক অবস্থানের বাইরে নিয়ে গ্রামের মানুষদের সাথে মিশতে পারেন সেখানে এইরকম মিটিং ছাড়াও তাঁদের মধ্যে স্কুল সম্পর্কে ব্যক্তিগত পর্যায়ে আলাপ আলোচনাও চলতে থাকে।

তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি, নিঃসন্দেহে শিশুদের পারিবারিক ও সামাজিক পটভূমি। এতে কোনও সন্দেহ নেই যে শ্রমজীবী পরিবারের শিশুরা বাড়িতে পড়াশুনা করার ক্ষেত্রে কম সাহায্য পায়, সে ক্ষেত্রে শিশুকে প্রাইভেট টুশনে দেওয়া অনেক সময় হিতে বিপরীত হয়ে দাঁড়ায়। দরিদ্র পরিবারের বড়রা তাদের রুজি রোজগারে এতটাই ব্যস্ত থাকেন যে অনেক সময়ই এই পরিবারের শিশুদের গৃহকার্যে সাহায্য করতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে বড়রা বাইরে কাজ করতে গেলে শিশুরা তাদের সঙ্গে যেতে বাধ্য হয় যা নিঃসন্দেহে তাদের পড়াশুনোর ধারাবাহিকতাকে বিঘ্নিত করে।

চতুর্থত, যদিও পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা এবং শিশু ভর্তি যথেষ্ট ভাল, কিন্তু প্রাক-প্রাথমিক স্কুলের দুর্বল পরিচালনা এবং প্রাথমিকোত্তর প্রতিষ্ঠানের অভাব প্রাথমিক শিক্ষাকে প্রভাবিত করছে। পশ্চিমবঙ্গে অঙ্গনবাড়িগুলিতে পড়াশুনোর রেওয়াজ প্রায় নেই, অপরদিকে প্রাথমিক-উচ্চ প্রাথমিক স্কুলের অনুপাত ভারতবর্ষে রাজ্যগুলির মধ্যে সবচেয়ে খারাপ। ফলত শিশুরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশের সময় যথেষ্ট প্রস্তুত থাকে না, এবং উচ্চপ্রাথমিক স্কুলের অভাবে প্রাথমিক শিক্ষায় অনুপ্রাণিত বোধ করে না।

পঞ্চমত, স্কুলের পরিকাঠামো বিগত দশকে সর্বশিক্ষার মিশনের হস্তক্ষেপে আমূল পরিবর্তন লাভ করেছে কিন্তু এই পরিবর্তনের অল্পই দূরবর্তী অঞ্চলগুলিতে পৌঁছেছে। স্কুলের পরিকাঠামোর সঙ্গে অন্যান্য সাধারণ পরিকাঠামোর কোন পরিবর্তন (যেমন রাস্তা, বিদ্যুৎ ইত্যাদি) না হওয়ায় তার প্রভাব সীমিত থেকেছে।

নানান সমস্যা থাকা সত্ত্বেও এটা স্পষ্ট যে সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মধ্যে শিক্ষার চাহিদাটি গুণগতভাবে বদলে গেছে— অভিভাবকরা তাদের সন্তানকে শুধু 'নাম সই' করা শেখার জন্য স্কুলে পাঠান না। প্রাইভেট স্কুল এবং প্রাইভেট টুশ্যনের রমরমার পেছনে একটা বড় কারণ এই চাহিদা। অনেক ক্ষেত্রে অভিভাবকদের আশা যে তাদের সন্তানের শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিবারের থেকে যে সাহায্য পাওয়ার কথা প্রাইভেট টুশন সেটা যোগান দেবে।

গোটা ব্যবস্থায় একটা বড়সড় পরিবর্তনের দাবি আমাদের তুলতে হবে। স্কুল, স্ব-ক্ষমতা অর্জনের একটি প্রতিষ্ঠান; সেই স্কুলেই যে পঠনের বোঝা আমাদের নীতি নির্ধারকরা চাপিয়ে দিয়েছেন তাতে শিশুর স্বাধীনতার বৃত্তটিকে আরো সংকুচিত করে দেওয়া হয়। এ প্রশ্নটাতো সে তুলতেই পারে, 'স্কুলে পাঁচ ঘণ্টা পড়ার পর, আবার বাড়িতে গিয়ে পড়তে হবে কেন?' এই বাড়ির পড়ার সঙ্গেই প্রাইভেটের যোগ— যেহেতু অনেক বাবা-মাই নিজের ছেলেমেয়েদের পড়ানোর সামর্থ্য থেকে বঞ্চিত, সে কারণে আর্থিক ক্ষমতার বাইরে গিয়ে তারা সন্তানকে প্রাইভেটে দিচ্ছেন। কিন্তু শিশু তাতে বেশি শিখছে, তার প্রমাণ নেই।

ত্রুটিপূর্ণ হলেও সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার কোন বিকল্প নেই। যেটা প্রয়োজন সেটা হলো সমাজের সর্বস্তরে এই ত্রুটি দূর করার প্রয়াস। নাগরিক সমাজ, রাজনৈতিক সমাজ, ব্যক্তি এবং সরকারি বেসরকারি সংস্থাগুলিকে বারবার ভাবতে হবে আমরা এ বিষয়ে কতটা সরব ও সচেষ্ট।

পশ্চিমবঙ্গে গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন শ্রেণীর কত শতাংশ ছাত্রছাত্রী সহজ অংক করতে পারে : ২০০৯

শ্রেণী	*কিছু পারে না*	*সংখ্যা চিনতে পারে*		*বিয়োগ পারে*	*ভাগ পারে*	*সর্বমোট*
		১-৯	১১-৯৯			
প্রথম শ্রেণী	২০.১	৪৭.৫	২৩.২	৮.৪	০.৮	১০০
দ্বিতীয় শ্রেণী	৪.৮	৩৬.৭	৩২.২	২১	৫.২	১০০
তৃতীয় শ্রেণী	২.৩	২১.৪	৩২.৫	২৮.১	১৫.৭	১০০
চতুর্থ শ্রেণী	০.৯	১০.৭	২৫.১	৩৪	২৯.৪	১০০
পঞ্চম শ্রেণী	১	৭.৪	১৯.৯	৩৫.২	৩৬.৫	১০০
ষষ্ঠ শ্রেণী	০.৬	৩.৬	১৩.৫	৩০.৭	৫১.৭	১০০
সপ্তম শ্রেণী	০.১	২.৩	১০.৩	২৩.৪	৬৩.৯	১০০
অষ্টম শ্রেণী	০.২	১.২	৫.৩	২০.১	৭৩.৩	১০০

সূত্র : ASER (www.asercentre.org)

শিক্ষা সংকট

বেচো না বেচো না

সলিল বিশ্বাস

প্রশ্নটা প্রধানত দৃষ্টিভঙ্গি এবং শ্রেণী অবস্থানের। শিক্ষা যদি সকলের হয়, তাহলে তাকে ব্যবসায়িক জায়গা থেকে দেখা যায় না কোনোমতেই। কিন্তু প্রথমেই যদি ধরে নেওয়া হয় যে কেবলমাত্র মধ্যবিত্ত আর উচ্চ-মধ্যবিত্ত এবং অর্থবান মানুষের জন্যই শিক্ষাকে আগলে রাখা হবে, তাহলে শিক্ষা হয়ে দাঁড়াবেই পণ্য, যে পণ্য উৎপাদিত হবে, বিক্রয় হবে, বিতরিত হবে কেবল তাদেরই জন্য যাদের থাকবে সেই পণ্য ক্রয় করার ক্ষমতা, যার উৎপাদনের এবং বিতরণের সম্পূর্ণ খরচ যোগাবে উপভোক্তারা। এই উৎপাদন প্রক্রিয়া স্বভাবতই নিয়ন্ত্রিত হবে কর্পোরেটদের দ্বারা যাদের নিজস্ব মুনাফালোভী বিশ্ববীক্ষা নির্ধারণ করবে তার সব কিছু।

ভারতে শিক্ষার পণ্যায়ন শুরু হয়েছে অনেক আগে থেকে। নানা ভাবে সরকার চেষ্টা করে এসেছে কী ভাবে উচ্চশিক্ষা থেকে সব সরকারি অনুদান আর অংশগ্রহণ বন্ধ করে দেওয়া যায়। শিক্ষা এমন একটা এলাকা যা সম্পর্কে মানুষের মনে একটা শ্রদ্ধাশীলতা আছে। তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হয় না। অথচ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থার মাধ্যমে বহু কোটি ডলার (পৃথিবীব্যাপী সরকারি বেসরকারি মিলিয়ে ২ লক্ষ কোটি ডলারেরও বেশি) মূল্যের শিক্ষাব্যবসার ভারতীয় অংশ দখল করার চাপ এসেছে লাগাতার। তাই সরকার নানা ঘুরপথে এই কাজ করতে চেষ্টা করেছে।

শিক্ষার বেসরকারীকরণের পক্ষে নানা রকম যুক্তি খাড়া করা হয়। সরকারের যথেষ্ট অর্থ নেই। দেশের মানুষের জন্য বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে শিক্ষার ব্যবস্থা করা তাই অসম্ভব। প্রাথমিক শিক্ষায় খানিকটা সম্ভব যদি বা হয়, উচ্চশিক্ষায় সেটা হবে না। তাছাড়া, হবেই বা কেন? অন্য সব পরিষেবার মত শিক্ষাও একটি পণ্য। তা টাকা দিয়ে কিনতেই হবে। উচ্চমানের শিক্ষা পেতে হলে স্বভাবতই উচ্চমূল্য দিতে হবে। বেশি খরচ হলে তো সাধারণ মানুষের অসুবিধা হবে। তাহলে? তাহলে যার যতটা সামর্থ্য ততটা মানই সে পেতে পারবে। আর তাছাড়া, খরচ তো বাজারের নিয়ম অনুযায়ী কমবে। কী করে? প্রথমে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান বেশি খরচে শিক্ষাপণ্য উৎপাদন করে বেশি মুনাফায় অল্পসংখ্যক সক্ষম লোকের কাছে তা বিক্রয় করবে। কিন্তু বাজারের আয়তন যত বাড়বে এবং উৎপাদকরা যত বেশি সংখ্যায় নিয়ন্ত্রণহীন ভাবে বাজারে যোগ দিতে পারবে তত প্রতিযোগিতা বাড়বে এবং মূল্য হ্রাস পাবে, যদিও গুণমান কমবে না, বরং বাড়বে। এবং সমাজেরও মঙ্গল হবে। এই কথাগুলো একেবারেই যুক্তিগ্রাহ্য নয়।

সরকারের টাকা নেই এই কথা ধোপে টেঁকে না। শিক্ষায় অনুদান দেবার টাকা নেই, অথচ অন্যান্য খাতে বাজেট বরাদ্দ কিছু কমে না। শিক্ষাখাতে বরাদ্দের পরিমাণ এমনিই অনেক কম। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বক্তব্য মেনে গত কুড়ি বছর ধরে বরাদ্দ কমানোই হয়ে এসেছে। ১৯৯০ সালে জিডিপি-র ৪ শতাংশ বরাদ্দ ছিল শিক্ষাখাতে। সেটা কমে হয়েছে ৩.৫ শতাংশ সাম্প্রতিক সময়ে। এই বরাদ্দ কমাবার উদ্দেশ্যই হল উচ্চশিক্ষাকে বেসরকারিকরণের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। ১৯৯০-৯১ সালে ছাত্র প্রতি খরচ ছিল ৭৬৭৬ টাকা (১৯৯৩-৯৪ দ্রব্যমূল্য হিসাবে)। ২০০২-০৩ সালে সেটা কমে হল ৫৫২২ টাকা। পরবর্তীতে এটা আরও কমেছে।

সরকারি-বেসরকারি অংশীদারী ব্যবস্থায় বেসরকারি বিনিয়োগকে জোরদার করা যায় ভরতুকি আর অন্যান্য সুবিধা দিয়ে, যেখানে নিয়ম হলো মুনাফা হলে তা হবে বেসরকারি বিনিয়োগকারীর, ক্ষতি হলে তা যাবে সরকারি তহবিল থেকে। তাছাড়া, শিক্ষা কারখানায় উৎপাদিত পরিমাপযোগ্য বস্তু নয়। শিক্ষায় নিহিত মানবিক বিনিময় বাজারি উৎপাদনের নিয়ম মেনে চলতে পারে না। মুনাফা বাড়লে বেশি প্রতিষ্ঠান এগিয়ে আসবে ঠিকই, কিন্তু তারা কেউই মূল্য কমাবার চেষ্টা করবে না, বরং ছাত্রদের কাছ থেকে আরও বেশি টাকা নিয়ে মুনাফা বাড়াবারই চেষ্টা করবে।

নব্বই-এর দশকের গোড়া থেকেই বিশ্বায়নের শুরু। তখন থেকেই বিদেশি ও স্বদেশি বৃহৎ পুঁজির চাপে এবং নিজস্ব ভাবধারার তাগিদে সরকার উচ্চশিক্ষায় বিনিয়োগ ভীষণ ভাবে কমাতে থাকে। শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের বেতন নেওয়া দুষ্কর হয়ে পড়ে। ১৯৯২-৯৩ সালের পুন্নায়া কমিশন (Punnaiyya Commission) সুপারিশ করে যে, সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে নিয়মিত খরচের ২৫ শতাংশ অর্থ ছাত্রদের কাছ থেকে তুলে নিতে হবে এবং প্রতিষ্ঠানকে নানা ভাবে অর্থ উপার্জন করে নিতে হবে।

১৯৯৭ সালে 'ভারতে সরকারি অনুদান: একটি আলোচ্য দলিল' (Government Subsidies in India: Discussion Paper) পেশ করে অর্থমন্ত্রক বলে যে, প্রাথমিক ছাড়া অন্য সব স্তরের শিক্ষায় অনুদান বন্ধ করে দেওয়া হোক।

২০১০ নাগাদ কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ মন্ত্রী ১০০-দিনের কর্মসূচী ঘোষণা করে যশপাল কমিটির প্রতিবেদন সর্বতোভাবে গ্রহণ করলেন। এই কর্মসূচি নির্লজ্জভাবে শিক্ষার পণ্যায়নের পক্ষে যুক্তি সাজালো। বোঝাই গেল, পিপিপি মডেল (Public Private Partnership), সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ এবং বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশের পথ প্রশস্ত করাই এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা নির্ধারিত বাজার অর্থনীতি অনুযায়ী আন্তর্জাতিক পুঁজির স্বার্থে পরিষেবা বাণিজ্য বিষয়ক সাধারণ চুক্তির (General Agreement on Trade in Services)

অধীনে শিক্ষা পরিচালনা করাই যে সরকারের উদ্দেশ্য তা এ থেকেই স্পষ্ট হয়। সংবিধানের ধারা অনুসারে জনগণের সামাজিক উন্নয়ন বা জাতীয় স্বার্থ, কোনোটার দিকেই আর দৃষ্টি দেওয়া যে হবে না সেটা প্রায় ঘোষণাই করে দেওয়া হল। শিক্ষার উপরে এই নয়া-উদারনৈতিক আক্রমণ বস্তুত জ্ঞানার্জনের ঐতিহাসিক ধারাকেই নস্যাৎ করার চেষ্টা চালায়। শিক্ষা হয়ে দাঁড়াবে একটি বাণিজ্যিক পণ্য যার কেনাবেচা চলবে খোলা বাজারে, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার আয়ত্বাধীনে। জনমুখী শিক্ষা অনেকদিন থেকেই বিভিন্ন সরকারি নীতি আঘাতে ক্ষীয়মান হয়ে আসছিল। এখন অবস্থা হবে আরও মারাত্মক। উচ্চশিক্ষা আর সাধারণ মানুষের নাগালে থাকবে না, শিক্ষার সুযোগ সীমিত হবে, সাধারণভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি হয়ে দাঁড়াবে নিম্নস্তরের (একটা প্রেসিডেন্সি কলেজ বা সেন্ট জেভিয়ার্স বা রামকৃষ্ণ মিশন দাঁড়াবে একশোটা নিম্নমানের কলেজের বিপরীতে), শিক্ষা হয়ে পড়বে ভারতীয় অর্থনীতির সঙ্গে সঙ্গতিবিহীন।

এনডিএ সরকার প্রধানমন্ত্রীর কাউন্সিল অব ট্রেড অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-র (Council of Trade and Industry) মাধ্যমে একটি বিশেষ 'সাবজেক্ট গ্রুপ' তৈরি করেন যার উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন ক্ষেত্রগুলিতে বেসরকারি বিনিয়োগের নীতি-কাঠামো গড়ে তোলা। এই গ্রুপ-এ ছিলেন দু'জন 'বিশেষজ্ঞ', মুকেশ আমবানি এবং কুমারমঙ্গলম বিড়লা, যাঁদের সরকার মনে করেছিলেন ভারতীয় জনগণের স্বার্থ রক্ষার্থে যোগ্যতম ব্যক্তি। ২০০০ সালের এপ্রিল মাসে এই দুই জনগণের সেবক একটি রিপোর্ট পেশ করেন যার মূল বক্তব্য ছিল যে শিক্ষার মত এত লাভজনক বাজার আর কিছু নেই। তাঁদের নির্ধারিত নীতি প্রায় ঘোষণা করল যে উচ্চশিক্ষাকে একটি বাজারে পরিণত করতে হবে যার মূল চালিকাশক্তি হবে মুনাফা। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হবে তারাই যারা বিশাল টাকা দিতে পারবে মাইনে হিসেবে। শিক্ষার পুরো নিয়ন্ত্রণ থাকবে শিল্পপতিদের হাতে এবং শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে মালিকের ইচ্ছা আর আদেশের সঙ্গে সঙ্গতিশীল সুনম্য অথচ দক্ষ শ্রমিক বা কর্মী তৈরি করা যারা সহজে নতুন নতুন প্রকৌশল **আয়ত্ত** করতে পারবে। এই সব নমনীয় মানবসম্পদ তৈরি করার লক্ষ্যে আইন করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রাজনৈতিক কাজ, চিন্তা ও ভাবধারার প্রবেশ বন্ধ করতে হবে। কোনো রকম ইউনিয়ন করাও চলবে না।

২০০৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) 'একবিংশ শতাব্দীর ভারতে বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত আদর্শ আইন প্রণয়ন প্রসঙ্গে' নামে একটি 'কনসেপ্ট পেপার' প্রচার করে। তাতে বলা হয়, ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে ভবিষ্যতের জন্য যুগোপযোগী করে তুলতে হবে এবং সেই কারণে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় 'বাণিজ্যিক এবং কর্পোরেট সংস্কৃতি' আমদানি করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে সরকারি অনুদান থেকে মুক্ত হয়ে সঠিক ভাবে আর্থিক সম্পদ সংগ্রহ করে আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠতে হবে। এই আদর্শ আইনটি আম্বানি-বিড়লা প্রদত্ত বাণীসমূহকে বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যেই রূপায়িত হবে।

আম্বানি-বিড়লা রিপোর্ট, স্যাম পিত্রোদা-র নলেজ কমিশন রিপোর্ট, যশ পালের উচ্চশিক্ষার উন্নয়ন সংক্রান্ত রিপোর্ট, সবগুলির উদ্দেশ্যই ছিল এক— শিক্ষায় নয়া উদারনীতিকে প্রোথিত করা। এই উদ্দেশ্যে ইউপিএ সরকার বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করতে চেয়েছে। যেমন, বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে প্রবেশের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য The Foreign Educational Institutions (Regulation of Entry and Operations) Bill, 2010, The Educational Tribunals Bill, 2010, The Prohibition of Unfair Practices in Technical Educational Institutions, Medical Educational Institutions and Universities Bill, 2010, The National Accreditation Regulatory Authority for Higher Educational Institutions Bill, 2010।

সরকার এখন শিক্ষার সর্বক্ষেত্রে (এবং অন্যান্য ক্ষেত্রেও) সরকারি-বেসরকারি অংশীদারী প্রথা (Public Private Partnership) চালু করেছে, যার দ্বারা সরকারি জনগণের টাকা বেসরকারি ও বিদেশি করপোরেট পুঁজির তহবিলে ঢেলে দেওয়া যায়, এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি যাতে ছাত্রদের ফি যথেচ্ছ বাড়িয়ে মুনাফা অর্জন করতে পারে। ছাত্রদের স্বল্প সুদে ঋণদান প্রকল্পগুলি বস্তুত ব্যয়বহুল বেসরকারি বা বিদেশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির স্বাস্থ্য ভাল করে তোলার জন্য একটা কৌশল ছাড়া কিছু নয়। শিক্ষায় ঋণদানের জন্য প্রতিষ্ঠিত জাতীয় অর্থসংস্থান নিগমও (Education Finance Corporation of India Ltd.) একই উদ্দেশ্যে গঠিত। কেবল ছাত্রদের নয়, মুনাফা অর্জনের জন্য প্রতিষ্ঠিত নানা জাতের বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকেও এই নিগম সরকারি কোষাগার থেকে ঋণ দেবে। বিদেশি পুঁজির অনিয়ন্ত্রিত সরাসরি বিনিয়োগের পথ পরিষ্কার করার জন্য চলছে আইন প্রণয়নের চেষ্টা। চুলোয় যাক সংবিধান, চুলোয় যাক সুষম উন্নয়নের নীতি, সামাজিক ন্যায় বা জাতীয় সার্বভৌমত্ব। একমাত্র দায় হল বিদেশি প্রভুদের নির্দেশ মেনে চলে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নীতিকে সার্থক করে তোলা। অথচ এখন প্রয়োজন হল সরকারি বিনিয়োগ বহুগুণ বাড়িয়ে দেশের পাঁচশোর বেশি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির এবং বাইশ হাজারের বেশি কলেজের উন্নয়ন সাধন করা। একাজ কখনো গুটিকতক বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়কে ডেকে এনে বা কিছু তথাকথিত উৎকর্ষবান বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করে করা সম্ভব নয়।

সরকারি-বেসরকারি অংশীদারী প্রথা কেবল মুনাফালোভেরই জন্ম দেবে। মুনাফাই মূল কথা বলে, অনেক বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই আছে যেখানে শিক্ষার মান যথেষ্ট নিচু কিন্তু বাইরের চাকচিক্য বেশি। শিক্ষার মৌলিক উন্নতি বা সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষার প্রসারে তাদের কোনো আগ্রহ নেই। অ্যামিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মত প্রতিষ্ঠান হয়ত উচ্চস্তরের শিক্ষা দেয়, কিন্তু তার অর্থমূল্য সাধারণের আয়ত্বের অনেক বাইরে। সেখানে অধিকাংশ মানুষকেই সেখানে পড়তে গেলে শিক্ষাঋণ

নিয়ে পড়তে যেতে হয় এবং যেসব মধ্যবিত্ত মানুষ সেখানে সন্তানদের পড়ান তাদের প্রায় সর্বস্বান্ত হতে হয়। অ্যামিটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানে দরিদ্র মানুষের কোনো স্থান তো নেই-ই, চিন্তাতেও উচ্চবিত্ত স্বপ্ন দেখানো হয় এবং ক্ষমতাকেন্দ্রের আজ্ঞাধীন হতেই শেখানো হয়।

এই ধরনের বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিকে নানা রকম ছদ্মবেশী ও সরাসরি অনুদান সরকার থেকে দেওয়াই হয়ে থাকে। সরকার এই সব প্রতিষ্ঠানকে স্বল্পমূল্যে এমনকি বিনামূল্যেও জমি দেয়, নানা ভাবে কর ছাড় দেয়, এমনকি সন্তানদের এই সব বিদ্যালয়ে পড়ালে পিতা-মাতাকেও নানা রকম করছাড় দেওয়া হয়ে থাকে। এমন একটি হল সাউথ এশিয়ান ইউনিভার্সিটি। ভারত সরকার এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ মূলধনীয় ব্যয় (৩০০ মিলিয়ন ডলার) বহন করছে। তাকে দক্ষিণ দিল্লিতে ১০০ একর জমি দিয়েছে। এখানকার সর্বকনিষ্ঠ শিক্ষক অন্য কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র প্রফেসরের সমান বেতন পেয়ে থাকেন।

বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় ভারতে অবাধে প্রবেশ করতে পারলে কারোরই কোনো লাভ হবে না, ওই বিদেশি বিনিয়োগকারীদের ছাড়া। কোন তেমন উচ্চপর্যায়ের বিশ্ববিদ্যালয় এখানে ক্যামপাস খুলতে আসবে না। যদি বা আসে তাদের ব্যবস্থা ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মতই হবে, কারণ তারা তো বিদেশে তাদের যে পরিকাঠামো আছে তা এখানে আনতে পারবে না। শিক্ষকও তারা এখানেই নিয়োগ করবে, পাঠক্রমও তাদের এখানকার মতই হবে। কিন্তু বিদেশি তকমার ফলে খরচ হবে বহুগুণ বেশি। সে খরচ কেবল বিত্তবানেরাই বহন করতে পারবে। কিন্তু তাতে তো মুনাফা সর্বোচ্চ স্তরে যেতে পারবে না। আসলে তাদের নজর রয়েছে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারী ব্যবস্থার প্রতি। এবং, সব সময় দেশি বিদেশি বিনিয়োগকারীরা সরকারকে চাপ দিচ্ছে আর্থিক ভাবে দুর্বল মানুষজনকে বেশি করে বৃত্তি দিতে, বেশি করে শিক্ষাঋণ পাইয়ে দিতে। তাহলেই তারা বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ নিতে পারবে। এর ফলে সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হবে, বিনিয়োগকারীর লাভ হবে বেশি।

আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডারি মাল নয়। তা গড়ে ওঠে অনেক পরীক্ষা, অনেক আন্তসম্পর্ক, অনেক প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে। খুব বেশি হলে তাকে পরিকাঠামো আর রিসোর্স দেওয়া যেতে পারে। বিদেশি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তুলনীয় হতে গেলে তার পরিমাণ হবে অভাবনীয়। সেই টাকা বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে দিলে তারা অনেক বেশি উন্নতি করতে পারে। আইআইটি (IIT) আর আইআইএম-গুলি (IIM), এআইআইএমএস (AIIMS), জেএনইউ (JNU), দিল্লি ইউনিভার্সিটি, টিআইএফআর (TIFR), বিএআরসি (BARC), ইসরো (ISRO), কোনোটাই এক দিনে গড়ে ওঠেনি।

যেখানে ১৭ থেকে ২৩ বছর বয়সীদের ৭ শতাংশেরও কম উচ্চশিক্ষার সুযোগ পায়, দরিদ্র মানুষ যেখানে উচ্চশিক্ষার কথা ভাবতেই পারে না সেখানে বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠনপাঠনের ভাবনাটাই একটা বৃহৎ ঠাট্টা। একথা শিক্ষার তথাকথিত কর্ণধাররা ভালোই জানেন। তাঁদের সে নিয়ে কোনো চিন্তাই নেই। তাঁরা কেবল নিজস্ব শ্রেণীস্বার্থ ও বিদেশি প্রভুদের মুনাফা বৃদ্ধির চিন্তাতেই ব্যস্ত। তাঁরা জানেন, উচ্চশিক্ষা মানুষকে সচেতন নাগরিক করে তোলে, যা তাঁদের শাসনের স্থায়ীত্বকে নড়বড়ে করে দেবে।

সম্পূর্ণ বেসরকারিকরণ না হলে যে উচ্চশিক্ষার উন্নতি নেই, শিক্ষাকে যে একটা বিক্রয়যোগ্য সামগ্রীতে পরিণত করতেই হবে, সে কথা প্রমাণ করার জন্য সরকার সচেতন ভাবেই দীর্ঘদিন থেকে নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং সেই সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে উচ্চশিক্ষার অবমূল্যায়ন ঘটিয়েছে একথা তর্কাতীত। আজকে যে প্রাক-স্নাতক শিক্ষাব্যবস্থা একেবারে ভেঙে পড়েছে, কলেজগুলির অস্তিত্বই যে অপ্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, তা সকলেই মানবেন। পশ্চিমবঙ্গের কথাই ধরা যাক।

যে কোনো একটা কলেজের ভর্তি থেকে শুরু করে পঠনপাঠন ও অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা ব্যবস্থা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার জন্য ছাত্র পাঠানো অবধি যদি লক্ষ্য করা যায় তাহলে এক শোচনীয় চিত্র চোখের সামনে ফুটে উঠবে। সামগ্রিক একটা অরাজকতার ছাপ সর্বত্র স্পষ্ট।

সব কলেজে বিপুল পরিমাণ ছাত্র ভর্তি করা হয়, পরিকাঠামো যতই অপ্রতুল হোক না কেন। ছাত্র ভর্তির প্রক্রিয়াতে প্রচুর দুর্নীতি থাকে। যেখানে স্থানীয় রাজনৈতিক দল ও তাদের পরিচালিত 'ছাত্র'সংসদগুলি অগ্রণী ভূমিকা নেয়। প্রাথমিক ভাবে 'মেধাতালিকা' মানা হলেও এক সময় সেই তালিকা অবান্তর হয়ে যায়। যত ছাত্র ভর্তি হয় তত বসার জায়গা থাকে না। প্রকারান্তরে তাদের বলেই দেওয়া হয় কলেজে আসতে হবে না। ফলে দাবি ওঠে, যতজন ভর্তির দরখাস্ত করেছে সবাইকে ভর্তি করে নিতে হবে।

যথেষ্ট ক্লাস হতে পারে না ঘরের অভাবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সমস্ত নিয়মাবলী থাকে তা মেনে চলা প্রায় যায়ই না। পূর্ণ সময়ের শিক্ষকের অভাবও এর একটা কারণ। এখন প্রায় সব কলেজে চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক, আংশিক সময়ের শিক্ষক আর অতিথি শিক্ষকের সংখ্যা পূর্ণ সময়ের শিক্ষকের থেকে অনেক বেশি। তাঁরা অনেক কম বেতনে একই কাজ করে থাকেন। এঁদের কাছ থেকে কত আর দায়বদ্ধতা আশা করা যায়, যদিও এঁরা সাধ্যমত ভালো করেই কাজ করেন। চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক, আংশিক সময়ের শিক্ষক আর অতিথি শিক্ষক দিয়ে কলেজ চালানো একটি সরকারের দিক থেকে সচেতন সিদ্ধান্তের ফল। কম খরচে বেশি কাজ করিয়ে নেওয়া এক্ষেত্রে সব চাইতে বড় অভিপ্রায়। এখন আবার এদের চাকরিতে এক ধরনের স্থায়ীত্ব দেওয়া হচ্ছে, যাতে এই ব্যবস্থাকে রীতিসিদ্ধ করে নেওয়া যায় এবং ভবিষ্যতে পূর্ণ সময়ের শিক্ষক নেওয়ার পথ বন্ধ করা যায়। একটা সময় শীঘ্রই আসবে যখন কলেজে আর পূর্ণ সময়ের শিক্ষক থাকবেই না।

অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা ব্যবস্থার হালও তথৈবচ। পরীক্ষা অনেক ক্ষেত্রে হয়ই না, হলেও তার ফলপ্রকাশ ইত্যাদি হয় দায়সারা। মূল্যায়নের কোনো সম্ভাবনাই সেখানে থাকে না। ফলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাতে বসতে পাঠানোর একটা ধাপ হিসেবে কাজ করার প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় কলেজগুলো। প্রাক-স্নাতক স্তরে কিন্তু পড়াশুনা না হবার কোনো যুক্তি নেই। আজকের পরিস্থিতি এই অবস্থায় এসে পৌঁছেছে ধারাবাহিক সরকারি অবহেলার ফলে এবং সেই অবহেলা, আমার মতে, অ-সচেতন নয়। নীতিগতভাবে, শিক্ষার বেসরকারিকরণের প্রক্রিয়া আদৌ নতুন কিছু নয়। নিজের নিজের খরচ নিজেরা সংগ্রহ করতে হবে, এই ধারণাকে গ্রহণীয় করে তোলার প্রক্রিয়াও চালু আছে বহুদিন ধরেই। কলেজগুলিকে নিজের খরচ নিজেকে জোগাড় করতে হবে, একথার বেশ কিছু বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। কলেজে ছাত্রদের বেতন বাড়িয়ে খরচ তুলতে হবে, বিভিন্ন নতুন বিষয় চালু করতে হবে যেগুলোকে বলা হবে 'আত্মনির্ভরশীল পাঠক্রম' (self-financing course), যে পাঠক্রমের জন্য যে কোনো পরিমাণ 'ফি' ধার্য করতে পারবে কলেজ— এই সমস্ত কথা বলে শেষ পর্যন্ত কিন্তু বেসরকারিকরণের হয়েই ওকালতি করা হচ্ছে। যখন বলা হচ্ছে কলেজগুলিকে স্বশাসিত করে দেওয়া হোক তখনও ওই বেসরকারিকরণের দিকেই ঝোঁক চলে যাচ্ছে। স্বশাসিত হলে কোনো এক সময় সরকার বলতেই পারবে, এবারে বাছা নিজের পথ দেখ। বর্তমানে চালু আইনগুলি এখনও সেই পুরোনো জনকল্যাণকামী রাষ্ট্রের ভাবনাকেই ধরে আছে, ফলে সেই সমস্ত আইন পরিবর্তনের প্রক্রিয়া চালু করছে কেন্দ্রীয় সরকার।

এ তো গেল চালু প্রতিষ্ঠানগুলির কথা। সেগুলো বেসরকারি যখন হবে তখন হবে, কিন্তু নতুন নতুন বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পত্তন করতে তো অসুবিধা নেই। তেমন অজস্র ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, মেডিকাল কলেজ, ম্যানেজমেন্ট কলেজ চালু হয়েছে। এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এগুলোর গুণমান পাতে দেবার অযোগ্য। প্রত্যেক দিন খবরের কাগজ খুললেই একথা স্পষ্ট হবে। প্রচুর অর্থব্যয় করে ছাত্ররা এই সব কলেজে ভর্তি হয়, এবং অনেক সময় তাদের বক্তব্য থাকে, এত খরচ করে ভর্তি হয়েছি, ফার্স্ট ক্লাস পাব না কেন, সবাই পাশ করব না কেন?

পশ্চিমবঙ্গে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আগেও হয়েছে। নবতম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকল্পে আইন পাশ হল সম্প্রতি, যে আইনবলে তৈরি হতে চলেছে টেকনো ইন্ডিয়া বিশ্ববিদ্যালয়। টেকনো ইন্ডিয়া ইতিমধ্যেই ১৫টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ১০টি ম্যানেজমেন্ট স্কুল এবং ১০টি পাবলিক স্কুল চালিয়ে থাকে। শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, এই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচুর কর্মসংস্থান হবে এবং প্রাক-স্নাতক শিক্ষায় আরও বেশি ছাত্র ভর্তি হতে পারবে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে খরচ কত হবে সে কথা নিয়ে কোন তথ্য তিনি দেননি।

কোনো দেশকে অর্থনৈতিক দিক থেকে উন্নত হয়ে উঠতে গেলে সে দেশের প্রাসঙ্গিক বয়সের মানুষদের অন্তত ২০ শতাংশ মানুষ উচ্চশিক্ষায় ব্যাপৃত থাকবে, একথা বহু গবেষণায় প্রমাণিত। কেবল দেশের উন্নতি নয়, জনগণের স্বাধীনতা রক্ষায়ও উচ্চশিক্ষার ভূমিকা আছে। উচ্চশিক্ষার সুযোগ যত কমবে, চিন্তার দৈন্য তত বাড়বে। চিন্তায় পরনির্ভরশীলতা কোনো জাতিকে স্বাধীন থাকতে দেয় না।

উচ্চশিক্ষার পণ্যায়ন মানুষের কাছ থেকে উচ্চশিক্ষার সুযোগ কেড়ে নেবে এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কোনো আম্বানি বা বিড়লা গরিব মানুষকে পড়াবার জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যে গড়বে না, একথা বুঝতে কোনো তথ্য আলোচনা করার দরকার পড়ে না। সংসদীয় গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে নিহিত হলেও ভারত রাষ্ট্রের সংবিধানে জনকল্যাণমূলক ভাবধারা থেকে উদ্ভূত শিক্ষাচিন্তা সাধারণ মানুষের জন্য উচ্চশিক্ষার ধারণাকে সন্নিবেশিত করেছিল। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা থেকে শুরু করে, আম্বানি-বিড়লা প্রতিবেদন কিন্তু সংবিধানের মূল বক্তব্যকে বিকৃত করতে বদ্ধপরিকর।

অনেকে বলেন, বিদেশি উচ্চশিক্ষার কেন্দ্রগুলি সব ক'টাই লাভক্ষতির হিসেব করেই চলে, সরকারি অনুদান সেখানে নেই। অনুদান না থাকলেও একথা ঠিক যে, যে মানসিকতা থেকে শিক্ষার মূল্যবোধ সেখানে ধরে রাখা হয় সযত্নে, সেই ভাবনা কি আমরা ভারতীয় শিক্ষাব্যবসায়ীদের কাছ থেকে আশা করতে পারি? অন্যদিকে, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্তন কিন্তু লোকহিতৈষণা থেকে।

শিক্ষা নিয়ে কথা বলতে গেলেই আমরা পশ্চিমের দিকে তাকিয়ে থাকি। আমরা মনে করি, পশ্চিমি ধাঁচটাই সব সময় কাম্য এবং আদর্শ। সে কথা আদৌ সঠিক নয়। কবে আমরা, অনিল সদগোপালের কথায়, উত্তর আমেরিকা আর ইউরোপের শিক্ষাব্যবস্থার আর্থ-সামাজিক চরিত্রকে প্রশ্ন করতে শুরু করব? কবে আমরা বুঝব যে, যে ব্যবস্থা ভয়াবহ মন্দার জন্ম দেয়, যে ব্যবস্থা ভূপাল বিভীষিকাকে সহ্য করে, যে ব্যবস্থা মনসান্টো-র মত দানবকে পুষে রাখে, প্রাকৃতিক সম্পদকে সংস্কৃতিকে পণ্যে পরিণত করে তা কখনো উচ্চস্তরের হতে পারে না।

সূত্র

Anil Sadgopal, 'Foreign universities bill is a bill to sell education out by degrees'. Daily News and Analysis, *Sunday*, March 21, 2010

All India Forum for Right to Education, *Neo-Liberal Assault on Higher Education*

Susan L. Robertson, 'Globalisation, GATS and Trading in Education Services', Centre for Globalisation, Education and Societies, University of Bristol, Bristol BS8 1JA, UK

'UGC Funding of Institutions of Higher Education', Report of Justice Dr. K. Punnaiyya Committee – 1992-93

Vijender Sharma, 'Commercialisation of Higher Education in India' *Social Scientist*, Vol. 33, No. 9/10, Debating Education (Sep. - Oct., 2005), pp. 65-74

প্রবন্ধ

কেমন আছে জঙ্গলমহল

বিশ্বজিৎ রায়

পর্ব - ২

জঙ্গলমহলে আপাতত শান্তিকল্যাণ। নয়া শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের রমরমা। 'উন্নয়ন' কর্মসূচি চলছে। পঞ্চায়েত ভোটের আগে তা আরও বাড়বে। কোনও সন্দেহ নেই দু'টাকা কেজি দরে চাল, মেয়েদের জন্য সাইকেল, রাস্তাঘাট-ব্রিজ-কালভার্ট, ইন্দিরা আবাস যোজনায় বাড়িঘর বা একশ দিনের গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্পে গরিব মানুষের কাজ— এ সবই খুব জরুরি। যারা এগুলোকে ছোট করে দেখেন তাদের সঙ্গে আমি একমত নই। কিন্তু একই সঙ্গে মনে করি, জঙ্গলমহল আন্দোলনকে কেন্দ্র করে আবর্তিত রাজনৈতিক প্রশ্নগুলির মীমাংসাও জরুরি। বিশেষ করে রাজনৈতিক বন্দীমুক্তির প্রশ্নটি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর দল বিধানসভা নির্বাচনের আগে বন্দীমুক্তির যে প্রতিশ্রুতি জঙ্গলমহলের ভিতরে-বাইরে নানা মঞ্চে দিয়েছিলেন, তার কী হল? তিনি তো তখন বলতেন: শুধু মাওবাদী নেতা-কর্মীরা নন, মাওবাদী সন্দেহে অথবা স্রেফ বিরোধী শিবিরের সমর্থক বলে যে হাজার হাজার গরীব আদিবাসী-মূলবাসী তরুণ-তরুণীকে গারদে পোরা হয়েছে বা মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়েছে পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকার। তাদের কাছে আজ মা-মাটি-মানুষের সরকারের বার্তা কী?

এই নিবন্ধে একইসঙ্গে উত্তর খোঁজার চেষ্টা করছি মাওবাদী দল এবং তাদের নেতৃত্বাধীন জনসাধারণের কমিটির কার্যকলাপ, বিশেষত তাদের বিকল্প, সমান্তরাল উন্নয়ন-প্রচেষ্টা এবং খতমের রাজনীতিকে, কী চোখে দেখছেন জঙ্গলমহলের মানুষ? যৌথবাহিনী প্রত্যাহারের প্রতিশ্রুতি থেকে নতুন সরকার সরে আসায় মানবাধিকার আন্দোলন এবং নাগরিক সমাজের একাংশ সঙ্গতকারণেই বিক্ষুব্ধ। কিন্তু জঙ্গলমহলের মানুষ এই দাবি প্রসঙ্গে কী ভাবছেন? কেন বন্দীমুক্তি ও যৌথবাহিনী প্রত্যাহারের দাবিতে জঙ্গলমহল ও তার বাইরে গণআন্দোলন গড়ে উঠল না? এই প্রশ্নে মাওবাদী নেতৃবৃন্দ ও অন্যান্যদের ভূমিকা কী? কেন এই প্রশ্নে জঙ্গলমহলের জনমত ও কলকাতার নাগরিক সমাজ বিভক্ত? শাসকীয় উন্নয়ন ও দমন-পীড়নের সাঁড়াশি আক্রমণের মুখেও সিঙ্গর-নন্দীগ্রাম গণপ্রতিরোধ গড়ে তুলে ঘুরে দাঁড়াতে পেরেছিল। জঙ্গলমহলে তা ঘটল না কেন?

অনেকের মতো আমিও এইসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছি। নানা পক্ষের মতামত জানা-বোঝার চেষ্টা করেছি। প্রথমেই বলে নেওয়া ভালো, সব উত্তর মেলেনি। জঙ্গলমহলের মানুষ এখনও ভীত-সন্ত্রস্ত। বহিরাগতদের কাছে মুখ খোলার আগে তারা পরিণাম সম্পর্কে সন্দিহান। তাছাড়া সীমিত সময়ের সফরে জঙ্গলমহলের সব প্রান্তের মানুষের সঙ্গে বিশদে কথা বলার সুযোগ পাইনি। পাইনি সাম্প্রতিক জঙ্গলমহল আন্দোলনের প্রধান নিয়ন্ত্রক, মাওবাদী নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলার সুযোগও। লালগড় আন্দোলনের সাফল্য ও ব্যর্থতা নিয়ে মূল্যায়ন তাঁরা নিশ্চয়ই করছেন। কিন্তু এখনও তা আমাদের হাতে বা জনসমক্ষে আসেনি। অদূর ভবিষ্যতে আসবে বলেও মনে হয় না। স্বাভাবিকভাবেই ঘাটতি থেকে যাবে এই প্রতিবেদনে এবং প্রাসঙ্গিক বিশ্লেষণে।

বন্দীমুক্তি

রাজনৈতিক বন্দীমুক্তি এবং মাওবাদীদের সঙ্গে মমতা-সরকারের শান্তি উদ্যোগ তথা মধ্যস্থদের ভূমিকা নিয়ে যে বখেড়া চলছে, তা নিয়ে এখানে আলোচনার সুযোগ কম। তবে তর্কাতীত সত্যটা এই যে, মৃতবৎসা শান্তি-উদ্যোগের সমান্তরালে চলা সরকারি বন্দী-মুক্তি পর্যালোচনার প্রক্রিয়াটির পরিণতি পর্বতের মূষিক প্রসবের সামিল। রিভিউ কমিটির প্রথম দফার সুপারিশ কাটছাঁট করে মুখ্যমন্ত্রী গতবছর স্বাধীনতা দিবসের আগেই যে ৫২ জনকে মুক্তিদানের প্রতিশ্রুতি দেন, তাঁদের মধ্যে জঙ্গলমহলের কেউ ছিলেন না। সাকুল্যে দুই মাওবাদী নেতা-কর্মীর নাম ছিল। তাঁদেরও তিনি বাদ দেন। বাকিরা সকলেই উত্তরবঙ্গের কামতাপুরী এবং গ্রেটার কোচবিহার আন্দোলনের নেতা-কর্মী। তাঁদের মুক্তিলাভের সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তাঁরাও সকলে ছাড়া পাননি।

ইতিমধ্যে রিভিউ কমিটির বকলমে নন্দীগ্রাম-সিঙ্গুরে তৎকালীন সরকার-বিরোধী আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে রুজু মামলাগুলির অধিকাংশ প্রত্যাহার করা হয়েছে। কমিটি সূত্রের হিসাব মোতাবেক নন্দীগ্রামে আট শতাধিক ও সিঙ্গুরে ১৩০টির বেশি মামলা প্রত্যাহার হয়েছে অথবা তা হওয়ার পথে। বাদ গেছে তাপসী মালিক হত্যা ও ধর্ষণ মামলা বা সিবিআই, সিআইডি-র তদন্তাধীন এবং হাইকোর্ট নির্দেশিত কয়েকটি মামলা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উপকৃতরা ভক্তিতে অথবা ভয়ে তৃণমূল সমর্থক। কিছু সিপিএম সমর্থকও আছেন বলে সরকারি ও কমিটি-সূত্রে দাবি।

তবে দুই জমানাতেই মাওবাদী সন্দেহে ধৃতদের মুক্তির সম্ভাবনা বিশ বাঁও জলে। বিগত জমানায় আন-ল'ফুল অ্যাকটিভিটিজ প্রিভেনশন অ্যাক্ট বা ইউএপিএ আইনে বন্দীর সংখ্যা ছিল নব্বইয়ের ঘরে। বর্তমান জমানায় তা বেড়েছে। তবে রিভিউ কমিটির 'টার্মস অব রেফারেন্স' বিগত সরকারের আমল পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। যদিও সে পর্বে ধৃত ও বন্দী ইউএপিএ-অভিযুক্তদের সম্পর্কে কমিটি কোনো সুপারিশ করেনি। কট্টর মাওবাদী বলে অভিযুক্তরা দূরস্থান, লালগড় আন্দোলনের সাধারণ কর্মী-সমর্থকদের বিরুদ্ধে রুজু মামলাগুলির সম্পর্কেও কোনও সুপারিশের কথা শোনা যায়নি এখনও। অথচ কমিটি-

সূত্রেই বলা হচ্ছে অন্তত ২০০০ টি মামলায় ঝুলে আছেন কয়েক হাজার মানুষ। ওদের অনেকেই জামিনে মুক্ত হলেও আদালত-থানা-হাজরিতে জেরবার। 'কেস-কানেকশন'-এর দৌলতে অগুনতি মানুষ গুচ্ছের মামলায় অভিযুক্ত। লসো হেমব্রম নামে একজনকে ৪৭টি মামলায় জড়ানো হয়েছে। কমপক্ষে ১৫০জন শীর্ষস্থানীয় নেতা-কর্মী এখনও বন্দী। অদূর ভবিষ্যতে তাঁদের ছাড়া পাওয়ার আশা নেই। জনসাধারণের কমিটির নেতৃস্থানীয় যারা জামিনে মুক্ত তাঁদের পাকে-প্রকারে নতুন শাসক দলের প্রতি বশ্যতা স্বীকারের শর্তে মুক্তি পেতে হয়েছে।

আর এরকমই এক মুচলেকা ভিত্তিক মুক্তি বা জামিন প্রাপ্তির জন্য রীতিমতো আবেদনপত্র ছাপিয়ে বিলি করছেন তৃণমূলের বিধায়কবৃন্দ— শালবনির শ্রীকান্ত মাহাতো, গোপীবল্লভপুরের চূড়ামণি মাহাতো বা নয়াগ্রামের দুলাল। এরা প্রত্যেকেই জনসাধারণের কমিটির সঙ্গে কমবেশি জড়িত ছিলেন। বিশেষ করে মাওবাদীরা প্রকাশ্য নেতৃত্ব ঘোষণার আগে। এঁরা কেউ কংগ্রেসি ঘরানার তৃণমূলী নন। নকশালপন্থী আন্দোলন বা ঝাড়খন্ড আন্দোলনের নানা গোষ্ঠীর সূত্রে তাঁদের রাজনীতিতে হাতেখড়ি এবং সিপিএম-বিরোধী আন্দোলনের জেরে তৃণমূল-ঘনিষ্ঠতা এবং শেষে সে দলের প্রার্থী হিসাবে গত বিধানসভা ভোটে জয়লাভ। জনসাধারণের কমিটি প্রকাশ্যে বা পরোক্ষে এঁদের নির্বাচনী প্রচারে মদত দিয়েছে। ফলে এঁদের মধ্যে শ্যাম রাখি না কূল রাখি টানাপোড়েন বিদ্যমান। সে কথায় পরে আসছি। আগে এঁদের বিধানসভা কেন্দ্র এলাকাগুলিতে দলীয় স্তরে বিলি করা মুচলেকা-পত্রের নমুনাটি পেশ করা যাক। বানান ও ভাষার গুরু-চণ্ডালিকা অবিকৃত রাখছি। নজরটান অমাদের।

প্রতি
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী
রাইটার্স বিল্ডিং, কোলকাতা-৭০০০০১
মহাশয়া
আমি শ্রী/শ্রীমতী......... পিতা/স্বামী......... গ্রাম/ওয়ার্ড...... পো......... ব্লক ঝাড়গ্রাম/সাঁকরাইল/গোপীবল্লভপুর-২......... এলাকার বসবাসকারী/কারিণী হইতেছি।

এতদ্বারা আপনার নিকট নিবেদন করিতেছি, আমি গত ২০০৬ সাল থেকে সিপিএম-বিরোধী তৃণমূল কংগ্রেস সহ বিভিন্ন দল নিয়ে গঠিন পশ্চিমবঙ্গ কৃষি জমি রক্ষা কমিটির একনিষ্ঠ কর্মী হিসেবে গত লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীর পক্ষে কাজ করেছি এবং তাই তদানীন্তন সিপিএম সরকার আমার বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত মামলাগুলি অন্যায়ভাবে দিয়ে আমাকে অত্যন্ত হায়রান করছে। আপনি গত বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে ইস্তাহারে বলেছিলেন বিনা দোষের বন্দীদের মুক্তির ব্যবস্থা করবেন (বামফ্রন্ট জমানায় রাজনৈতিক কর্মীগণের)।

অতএব মহাশয়া আপনার মা মাটি মানুষের সরকার, যদি ঐ রাজনৈতিক বন্দীদের মামলা প্রত্যাহার করে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালাতে সহায়তা করবেন। আশাকরি আপনি আমার/আমাদের এই আবেদনে সাড়া দিয়ে বাধিত করবেন।

মামলাগুলির বিবরণ।	নিবেদন
থানার কেশ নং.	ইতি
জি আর কেশ নং.	নমস্কারান্তে
কেশের ধারা........	আপনার অনুগত
তারিখ...........	স্বাক্ষর/টিপ

বয়ানেই মালুম, মুচলেকা-পত্র ছাড়া অন্য নামে এই আবেদনপত্রটিকে চিহ্নিত করা যায় না। যদিও এতে জঙ্গলমহল বা লালগড় আন্দোলনের উল্লেখ নেই, নেই জনসাধারণের কমিটি বা মাওবাদীদের প্রসঙ্গ, তৃণমূল বিধায়করা জানিয়েছেন জঙ্গলমহলের বন্দীমুক্তির প্রেক্ষাপটেই তাঁদের এই উদ্যোগ। তাঁদের কথায়, তাঁরা যে-যাঁর এলাকায় ভোটার তথা সমর্থক-কর্মীদের থেকে বন্দীমুক্তির জন্য চাপের মুখে পড়ছেন। ''আমার এলাকায় কয়েকশো আদিবাসী-মূলবাসী যুবক জঙ্গলমহল আন্দোলনের জেরে নানা মামলায় অভিযুক্ত। অনেকে এখনও জেলবন্দী। এঁরা অধিকাংশই জনসাধারণের কমিটির হাওয়ায় তার সঙ্গে যুক্ত ছিল। কিন্তু কট্টর মাওবাদী নন। সিপিএমের অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়ছিল। ভোটের আগে তৃণমূলও এদের মুক্তির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। এখন এদের মুক্তি না দিলে বা কেস না তুললে আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে আমাদের অসুবিধো হবে।'' —প্রাক্তন ঝাড়খন্ডি তথা নকশালপন্থী নেতা চূড়ামণি-বাবুর বক্তব্য।

জনসাধারণের কমিটির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বা নির্বাচনে কমিটির প্রচার ইতাদি প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেলেও তিনি স্মরণ করিয়ে দিলেন সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনের সহমর্মিতায় মাওবাদী ও অপরাপর সিপিএম বিরোধী শক্তিগুলি একযোগে জঙ্গলমহলেও বিক্ষোভ-অবরোধ চালিয়েছে। সেই সূত্রে কারাবন্দীও হন অনেকে। পুলিস সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জঙ্গলমহল আন্দোলনেও তারা সকলে সামিল ছিলেন। অন্তত শুরুর পর্বে। মাওবাদীদের সঙ্গে তাঁর একদা সু-সম্পর্কের কথা তুললে বিড়ম্বনার হাসি হাসলেন। তারপর জানালেন, প্রশাসনের তরফে এখন তৃণমূল বিধায়ক বা নেতাদের জঙ্গল-লাগোয়া এলাকায় সন্ধ্যায় দিকে যেতে বারণ করা হয়েছে। তাঁদের পুলিশি নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে। ওড়িশা বা ছত্তিশগড়ের মতো বিধায়ক-নেতা অপহরণের আশঙ্কাতেই এই সতর্কতা। তাঁর গাঁয়ের বাড়ি ছেড়ে অনেক সময়ই লোধাশুলির অফিসে থাকতে বাধ্য হন এই কারণেই।

একদা প্রধান হিসেবে জনপ্রিয় এবং আমজনতার কাছাকাছি মানুষ বলে এলাকায় পরিচিত মানুষটির স্বীকারোক্তি : ''আমি মাওবাদীদের কোনও ক্ষতি করিনি। তা সত্ত্বেও মারলে মারবে। তবে ওদের মুক্তির ব্যাপারটা আমার আওতার বাইরে। ওটা সরকারের টপ লেভেলের ব্যাপার।''

তরুণ শ্রীকান্ত মাহাতোও বন্দীমুক্তির এই দলীয় উদ্যোগকে সমর্থন করলেন। তাঁর কথায়, ''ভোটের সময় আমি ও আমার

দল বন্দীমুক্তির দাবি তুলেছিলাম। এখনও আমি এটা তুলছি। অধিকাংশকেই মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়েছে। তবে যারা কট্টর মাওবাদী তাদের কেস আলাদা।'' শালবনির এই বিধায়ক এখনও যৌথ বাহিনী প্রত্যাহারের পক্ষে। তবে তাঁর শর্তও আছে। ''যৌথবাহিনী রাখার খরচ বিপুল। এই খরচ বাঁচলে অনেক উন্নয়নের কাজ হবে। যৌথবাহিনীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে আগেও বলেছি। কিন্তু তারা চলে গেলে অন্য বাহিনী অত্যাচার করবে এটা মেনে নেব না।'' স্পষ্টতই তাঁর ইঙ্গিত মাওবাদীদের দিকে। ''আমরা সবাই ছিলাম জনসাধারণের কমিটিতে। কিন্তু মাওবাদীরা অন্য কাউকে মানবে না। ওদের কথামতো চলতে হবে। এসব মানতে পারিনি বলে সরে এসেছি।'' দুই বিধায়কই জানালেন, তাঁদের এলাকায় বিলি করা বয়ানের ভিত্তিতে বেশ কিছু আবেদন আইনমন্ত্রী মলয় ঘটকের কাছে তাঁরা জমা দিয়েছেন। ''অনেককেই ধীরে ধীরে জামিন দেওয়া হচ্ছে। পঞ্চায়েতের আগে আরও কিছু ছাড়া পাবে। কেস তোলার ব্যাপারেও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।''—শ্রীকান্ত জানালেন।

দুই বিধায়কই মুচলেকা প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেলেন। কেন মামলা-মুক্তি বা জামিন পেতে গেলে শাসকদলের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতে হবে? এর জবাবে তাঁদের যুক্তি স্পষ্ট : তাঁরা 'রাজনীতির বাস্তবতা বুঝে' যে যাঁর এলাকার ভোটার-সমর্থকদের ছাড়িয়ে আনতে চান। ''দিদি তো মাওবাদীদের ছাড়বে না। অথচ তলা থেকে চাপ আসছে। এই অবস্থায় এছাড়া আমাদের পথ নেই।'' ঘনিষ্ঠ মহলে এমনটাই বলছেন তাঁরা।

বলাবাহুল্য, এই উদ্যোগ নেহাৎ স্থানীয় স্তরের নয়। নেপথ্যে রাজ্যস্তরে তৃণমূল ও তার সহায়ক-অনুরাগীদের ভূমিকাও এতে প্রবল। তৃণমূলের তরুণ তুর্কি, মুখ্যমন্ত্রীর আস্থাভাজন এবং জঙ্গলমহলে দলীয় সংগঠন বিস্তারে তাঁর অন্যতম সেনাপতি সাংসদ শুভেন্দু অধিকারী তা গোপনও করেননি। তাঁর কথায়, এই উদ্যোগের সঙ্গে তিনি 'সম্পৃক্ত'। মাওবাদী দল বা জনসাধারণের কমিটির নেতা ছত্রধর মাহাতো সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মুক্তির বা তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহারের কথা তাঁরা বলছেন না। সিপিএমের 'হার্মাদবাহিনী'র মতোই মাওবাদীরা বা তাদের অনুগত কমিটি যাতে আর ''হিংসা ও নৈরাজ্যের রাজত্ব ফের কায়েম না করতে পারে'', সেটা নিশ্চিত করায় তিনি ও তাঁর দল বদ্ধপরিকর। তাঁরা দেখছেন কীভাবে ''মাওবাদী সন্দেহে ধৃত সাধারণ ও নিরীহ গ্রামবাসীদের মুক্তি ত্বরান্বিত'' করা যায়। তবে তিনিও এটা স্পষ্ট করে দিয়েছেন এহেন অভিযুক্তদেরও প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক স্ক্রিনিং বা বাছাই প্রক্রিয়া পার হতে হবে। প্রক্রিয়াটি যে আসলে নতুন শাসক দলের বশ্যতা স্বীকার এবং আনুগত্য নিশ্চিত করার পরীক্ষা তা তিনি খোলসা করে বলেন নি। তবে ইঙ্গিতটিই যথেষ্ট। ''অনেকেই পরিস্থিতি পরিবর্তনের সুযোগ নিতে চাইছে।'' অর্থাৎ সন্দেহভাজন নব্য-অনুগতদেরও নজরে রাখা হচ্ছে।

তৃণমূলের এই বিতর্কিত উদ্যোগ নিয়ে মানবাধিকার আন্দোলনে নানাবিধ প্রতিক্রিয়া। সুজাত ভদ্রের মতো কেউ কেউ সমর্থন ও সমালোচনা দুইই করেছেন। ভদ্রের বক্তব্য— ''প্রাথমিকভাবে স্বাগত এই উদ্যোগ। তবে সিপিএম-বিরোধী আন্দোলনে শুধু তৃণমূল কর্মীরাই সরকারি রোষের শিকার হননি। এই উদ্যোগ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, বৈষম্যমূলক এবং শাসকদলের প্রতি আনুগত্যের পক্ষে মুচলেকা আদায় যাতে মনে না হয় তার জন্য আবেদনপত্রের বয়ান বদলানো উচিত।'' বয়ান অবশ্য বদলায়নি বলেই জানি। অন্যদিকে এপিডিআর সাধারণ সম্পাদক দেবপ্রসাদ রায়চৌধুরীর বিরোধিতা তীব্র। ''সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের মতোই জঙ্গলমহলেও তৃণমূলে নাম না লিখলে মুক্তি মিলছে না। এতেই সরকার ও নয়া শাসকদলের স্বৈরাচারী, প্রতিহিংসাপরায়ণ ও পক্ষপাতমূলক মনোভাব স্পষ্ট।''

ছত্রধর মাহাতো

জঙ্গলমহলে বসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিচারিতা নিয়ে প্রকাশ্যে কথা বলার সাহস এখনও যারা রাখেন, তাদের প্রধান মুখ ছত্রধর মাহাতোর স্ত্রী নিয়তি মাহাতো এবং পরিবারের লোকজন। তাঁদের হারানোর বিশেষ কিছু বাকি নেই। বাড়ির মেজ ছেলে শশধর মাহাতো, মাওবাদী দলের স্কোয়াড লিডার এবং কিষেনজির অন্যতম ভাবশিষ্য, তথাকথিত সংঘর্ষে প্রাণ-হারিয়েছেন ২০১০ সালে। জেলবন্দী বড় ভাই ছত্রধর তাঁর দেহ সনাক্ত করেন। ছোট ভাই অনিল ২০০৩ এবং ২০০৯ দুইবার মাওবাদী সন্দেহে গ্রেফতার হয়ে দু'দফায় ১৮০ দিন জেল খেটে এসেছেন। ছত্রধরের বৃদ্ধ বাবা আশুতোষ মাহাতো এবং মা বেদনা মাহাতো এক ছেলের শোচনীয় মৃত্যুর পর বড়ছেলের কারামুক্তির আশায় দিন গুণছিলেন। কিন্তু বিস্তর দৌড়ঝাঁপের পর সে আশা আজ দুরাশামাত্র। এই অবস্থায় বৃদ্ধ দম্পতি শারীরিক ও মানসিকভাবে অসুস্থ। নিয়তি থানা-পুলিশ, কোর্ট-কাছারিতে ছুটে ক্লান্ত, বিধ্বস্ত। সন্ত্রস্ত পরিবারটির পাশে গাঁয়ের কিছু মানুষ ছাড়া কার্যত আর কেউ নেই। ছত্রধরের দুই ছেলে হস্টেলে থেকে পড়ত। পরিবারের এই দুর্যোগে তাদের পড়াশুনা শিকেয় ওঠার যোগাড়। এই পরিস্থিতিতে নিয়তি তো বলবেনই— ''আমাদের হারানোর আর কী-ই বা বাকি আছে!''

ছত্রধরদের গ্রাম আমেলিয়ায় আজ কালেভদ্রে মিডিয়ার পদার্পণ ঘটে। রাজনীতির পট-পরিবর্তন ঘটে গেছে। একসময় এই গ্রামে সংবাদমাধ্যম আর পুলিশ-যৌথবাহিনী নিত্যদিন হানা দিত। এখন সব শুনসান। গাঁয়ের লোকও নিস্পৃহ চোখে তাকিয়ে থাকে। দোতলা মাটির বাড়িটির শ্রীহীন মলিন দশা যেন পরিবারটির বিপর্যস্ত অবস্থাই জানান দিচ্ছে। নাগরিক বিলাসের একমাত্র লক্ষণ ছোট ডিস অ্যান্টেনাটি এখন গোলা পায়রাদের দখলে। চারপাশের দেওয়ালে টাঙানো ভাঙ্গা কলসিতে তাদেরই বসত। বকবকমে ম্লানমুখ গৃহটিতে প্রাণের সাড়া জাগিয়ে রেখেছে তারাই। অথচ এই বাড়ি ঘিরেই একসময় সিপিএম তথা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সরকার ছত্রধরের বিপুল সম্পত্তির কাহিনী

রটিয়েছিলেন। কিন্তু বিঘে ১৫ জমি আর কিছু গরুবাছুর নিয়ে বড়জোর মধ্যচাষী পরিবারটির বৈভবের কোন চিহ্ন খুঁজে পেলাম না।

গ্রীষ্মের দুপুরে পরিবারের সকলে বাড়িতেই ছিলেন। অল্প কয়েকদিন আগেই মুখ্যমন্ত্রী লালগড়ে সভা করে গিয়েছেন। সেকথা পাড়তেই নিয়তি ঝলসে উঠলেন। "ক্ষমতায় আসার পর এই নিয়ে তিনবার জঙ্গলমহলে এলেন মমতা। কিন্তু আমার স্বামী বা জনসাধারণের কমিটির বন্দী নেতা-কর্মীদের ছাড়ার প্রশ্নে রা কাড়েন নি একবারও। অথচ ২০০৯-১০ সালে কমিটির তৈরি জমায়েতে কত লম্বা চওড়া কথাই তো বলেছেন। এখন গদিতে বসে আমাদের কথা ভুলে গেছেন।" চল্লিশ ছুঁই ছুঁই পুত্রবধূর কথা শুনে এগিয়ে এলেন আশুতোষবাবু। বললেন, তাঁর ইচ্ছে ছিল লালগড়ের সভায় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার। "আমি ওঁকে ভোটের আগের প্রতিশ্রুতিগুলো স্মরণ করিয়ে দিতাম। কিন্তু যাইনি, কারণ ওর দলের লোকেরাই বলল, দেখা করতে দেবে না।" বেদনা দেবী নিতান্তই এক অসহায় মা। ভেজা চোখে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তাঁর মিনতি— "মমতা কি জানে না আমি এক ছেলেকে হারিয়েছি। আর এক ছেলে তিনবছর ধরে জেলে। ছত্রধরকে যে পুলিশ রিপোর্টার সেজে তুলে নিয়ে গেছে তা তো সকলেই জানে। তারপর মিথ্যে মাওবাদী মামলায় ফাঁসিয়ে রেখেছে। এসব কি মমতা জানে না? তাহলে ওকে ছাড়ছে না কেন?"

মায়েদের যুক্তি আর প্রতিহিংসার রাজনীতির প্যাঁচ যে এক জায়গায় মেলে না সে কথা বলতে পারিনি। তবে জঙ্গলমহলের সাম্প্রতিক অতীত বলে, পুলিশি সন্ত্রাসবিরোধী জনসাধারণের কমিটি তৈরি হওয়ার পর সিপিএম-বিরোধী জনমতকে নিজের পক্ষে টেনে এনে ক্ষমতার পথ মসৃণ করায় সফল হয়েছেন মমতা। এবং সে কাজে মাওবাদী নেতৃত্ব ও কমিটিকে ব্যবহার করেছেন তিনি। তারপর ছত্রধরদের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়েছে তাঁর কাছে। অথচ এই ছত্রধরের সঙ্গে একমঞ্চে সভা করতে ২০০৯ সালে মোটর সাইকেলে চেপে ছুটে এসেছিলেন তিনি। সে ছবি দেখিয়ে সিপিএম তৃণমূল-মাওবাদী আঁতাতের কথা নিয়ে প্রচারের ঝড় তোলে। ছত্রধর যে আদতে তৃণমূলের স্থানীয় নেতা ছিলেন, সে কথাও উঠে আসে। তাঁর পরিবারও সে কথা অস্বীকার করেন না। আশুতোষবাবুর কথায়, তাঁরা গোড়া থেকেই কংগ্রেসি পরিবার। শশধর ছাত্রবয়স থেকেই মাওবাদী রাজনীতিতে দীক্ষিত হলেও ছত্রধর তৃণমূল গঠনের পর সেদিকেই ঝোঁকেন। নিয়তিও কংগ্রেসি পরিবারের মেয়ে। একদফায় পঞ্চায়েতে ভোটে দাঁড়ান কংগ্রেসের টিকিটে। তিনি জানালেন, ২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচনেও তৃণমূলকেই ভোট দিয়েছেন তাঁরা। কিন্তু রাজনীতির আবর্তে সেই পরিবারটাই আজ তৃণমূল নেত্রীর কাছে বিষবৎ পরিত্যাজ্য।

কেন? এর জবাব সম্ভবত লুকিয়ে আছে ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ছত্রধরের প্রার্থী হওয়ার সিদ্ধান্তের মধ্যে। এই পর্বের নেপথ্য কাহিনীর অনেকটাই এখনও আড়ালে। মমতা-শিবিরের নানা কুশীলব এবং তাঁদের একদা-ঘনিষ্ঠ নাগরিক-সমাজের কতিপয় প্রতিনিধিদের বয়ান এবং নিয়তির বক্তব্য মিলিয়ে মোটামুটি ছবিটা স্পষ্ট হয়। সেটা হলো, ছত্রধর ও তাঁর ঘনিষ্ঠদের আশা ছিল, মমতা জনসাধারণের কমিটির স্বাধীন অস্তিত্ব ও গুরুত্ব স্বীকার করে আসন রফায় যাবেন। মধ্যস্থদের মারফত কথা চালাচালিও হয়। কিন্তু তা ভেস্তে যায়। এরপর জেলবন্দী ছত্রধর নির্দল প্রার্থী হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এতে মমতা রুষ্ট হন। দূত মারফত তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা হয়। এমনকি এমন প্রস্তাবও নাকি আসে, ঝাড়গ্রাম কেন্দ্রের বদলে জঙ্গলমহলের অন্য কেন্দ্রে দাঁড়ালে তৃণমূল নেত্রীর আপত্তি নেই। কিন্তু ছত্রধর রাজি হননি। তাঁর ঘনিষ্ঠ এবং লালগড় আন্দোলনের সমর্থক কলকাতার কিছু বুদ্ধিজীবী-কর্মীদের সাহায্যে নির্বাচন লড়তে নামেন। নিয়তির কথায়, ছত্রধর শেষ পর্যন্ত একটা আসনই চেয়েছিলেন মমতার কাছে। কিন্তু প্রত্যাখ্যাত হন। সিপিএম শশধরকে দেখিয়ে প্রচার করত ছত্রধরও মাওবাদী। অথচ ২০০৯ সালেও নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে আলোচনা করে লোকসভা ভোটের ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি। "আমার স্বামী ভোটে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি যে মাওবাদীদের মতো গণতন্ত্রে অবিশ্বাসী নন তা প্রমাণ করতে। তাছাড়া কমিটির নেতৃত্বে এতবড় আন্দোলনকে মুছে ফেলে তৃণমূলের ছাতার তলায় ঢুকে পড়তেও তিনি রাজি হননি।"

গোটা পর্বে মাওবাদী নেতৃত্বের ভূমিকা রহস্যময়। এখনও পর্যন্ত যা জানা গেছে, ছত্রধর প্রশ্নে তারা দ্বিধাবিভক্ত ছিলেন। জেলবন্দী এক নেতা লিখিতভাবে তাঁর ভোটে দাঁড়ানোর বিরোধিতা করেন। আমি সে লেখা পড়িনি। শুনেছি প্রধান যুক্তি ছিল, সিপিএম বিরোধী ভোট ভাগ হওয়ার ভয়। রণনীতিগত ভাবে পাকাপাকিভাবে নির্বাচন বয়কটে বিশ্বাসী হলেও মাওবাদীরা অতীতে এবং অনতি-অতীতে অন্ধ্র, বিহার, ঝাড়খন্ড, ছত্তিশগড় এবং পশ্চিমবাংলায় সরকার-বিরোধীদের গোপনে সমর্থনের ভূরি ভূরি নজির ছড়িয়ে রেখেছেন। সিপিএম বিতাড়নের লক্ষ্যে মমতার সঙ্গে অম্ল-মধুর সহাবস্থান ও সখ্যের পর্বে ছত্রধর-প্রশ্নে মাওবাদী নেতৃত্বের বিড়ম্বনা বোঝা যায়। তবে তাঁরা একেবারেই বেঁকে বসলে ছত্রধর শেষপর্যন্ত দাঁড়াতেন কিনা সন্দেহ রয়েছে নানা মহলেই। নিয়তি এ প্রসঙ্গ এড়িয়ে যান। "যে যার বিশ্বাস নিয়ে চলেছে। আমি কী বলব!" কিন্তু পরিণতি দাঁড়ায় এটাই যে ছত্রধরের নির্বাচনী প্রচারের দায়িত্ব নিয়তি এবং গুটিকয় স্থানীয় ও কলকাতাস্থ সমর্থকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। তৃণমূলের বিপুল প্রচারের ফাঁকে তা দাগ কাটতে ব্যর্থ হয়। বিজয়ী তৃণমূল এবং রানার-আপ সিপিএমের পর তৃতীয় স্থান পান ছত্রধর। তৃণমূলের ৪৪ শতাংশ এবং সিপিএমের প্রায় ৩৫ শতাংশ ভোটের পাশে ১৩ শতাংশ ভোট পান তিনি। ফলাফলের প্রতিক্রিয়ায় ছত্রধর সমর্থকরা অনেকে বলেছেন, সহায়-সম্বলহীন নামমাত্র প্রচারের পরও তাঁর ভোট প্রাপ্তির পরিমাণ ফেলনা নয়। অন্যদিকে তৃণমূল শিবির এবং মমতা-ঘনিষ্ঠ নাগরিক-সমাজের কেউ কেউ

বলেছেন— এর থেকেও কম প্রচার করে বহু আন্দোলনের জেলবন্দী নেতা-নেত্রীর বিপুল জয়ের উদাহরণ দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে। ছত্রধর বুঝতেই পারেননি সিপিএম-বিরোধী পালের হাওয়া মমতা কেড়ে নিয়েছেন। একবগ্গামি করতে গিয়ে নিজের দর কষাকষির ক্ষমতাও হারালেন তিনি। এরই জেরে ভোটের পরও ছত্রধর ও তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের জেলবন্দী করে রাখার জোর পেয়েছেন মমতা।

মাওবাদী-মমতা শান্তি আলোচনার উদ্যোগ পর্বে জড়িত কুশীলবদের কাছে শুনেছি— ছত্রধরের মুক্তি-প্রসঙ্গ তুললেই রেগে যেতেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর নাকি যুক্তি ছিল— মাওবাদী নেতৃত্বের সঙ্গে সমঝোতা হলেই বাকিদের ছাড়ার ব্যাপারে ভাববেন তিনি। তা নইলে ছাড়লেই তাঁরা এলাকায় ফিরে বেগড়বাই করে জঙ্গলমহলে অশান্তি সৃষ্টি করবেন। মধ্যপর্বে ছত্রধরের কাছে দূত-মারফত রফার প্রস্তাব নিয়ে নানা বিতণ্ডা হয়েছে। অভিযুক্ত মধ্যস্থ তো বটেই ছত্রধর ও তার সহবন্দীরাও মুচলেকা-প্রস্তাবের কথা অস্বীকার করেছেন। তবে মধ্যস্থ দল এবং ছত্রধরের স্ত্রী কাছে শুনেছি, ছত্রধর ও তাঁর সঙ্গীরা সরকারের সঙ্গে শান্তি-আলোচনাকে স্বাগত জানালেও 'হাতকড়া' পরে বন্দী অবস্থায় সে আলোচনা সম্ভব নয় বলেই জানিয়েছেন। ''আমার স্বামী চেয়েছিলেন তাঁর ও তাঁর সহবন্দীদের মুক্তি। তারপর একমাস নিজেদের মধ্যে এবং কমিটির সমর্থকদের সঙ্গে আলোচনা করে ভবিষ্যতের পথ ঠিক করার জন্য সময় চেয়েছিলেন। তা যে মুখ্যমন্ত্রী মানেন নি, তা তো দেখতেই পাচ্ছেন।''—ম্লান হেসে জানালেন নিয়তি।

মমতা যে জনসাধারণের কমিটি বা ছত্রধরদের স্বাধীন অস্তিত্ব মানবেন না তা স্পষ্ট পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহে। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের কনভয়ে মাইন বিস্ফোরণের জেরে ছিতামণি মুর্মু সহ আদিবাসী মহিলাদের উপর পুলিশি নির্যাতনে যুক্ত পুলিশ অফিসারদের ক্ষমাপ্রার্থনা ও শাস্তির দাবিতে উত্তাল হয়েছিল জঙ্গলমহল। ক্ষমতায় এসে মমতা তা নিয়ে উচ্চবাচ্য করেননি। কমিটির নতুন দাবিসনদ নিয়ে আলোচনার প্রস্তাবকে আমল দেননি। ইতিমধ্যে যে ক'জন শীর্ষস্থানীয় কমিটি নেতা জামিনে মুক্তি পেয়েছেন তারা সকলেই তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন বা দিতে বাধ্য হয়েছেন। অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় নেতারা অনেকেই 'সংঘর্ষে নিহত' অথবা অন্যভাবে খুন। কেউ কেউ গা ঢাকা দিয়েছেন। বিধ্বস্ত এবং ছত্রভঙ্গ এই সংগঠনের আজ অস্তিত্ব নেই। ছত্রধর, সুখশান্তি বাস্কে প্রমুখদের বিরুদ্ধে গন্ডা গন্ডা কেস চলছে। তাঁদের বিরুদ্ধে ইউএপিএ আইনেও মামলা চলছে।

ঝাড়গ্রাম আদালতের আইনজীবী কৌশিক সিনহার হিসেব অনুযায়ী ছত্রধরের বিরুদ্ধে তিরিশটার বেশি কেস। এর মধ্যে ৩-৪টি মামলায় চার্জশিট হয়নি। 'ফাইনাল রিপোর্ট' হয়েছে। ২-৩টিতে বিচার শেষ হয়েছে। কুড়িটির মতো মামলায় চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে। লালগড় থানার কেস নম্বর ১৬১/২০০৮ মামলাতেই তাঁর ও তাঁর সহবন্দীদের বিরুদ্ধে ইউএপিএ ধারা যুক্ত হয়েছে। এতে তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, মাওবাদীদের সঙ্গে মিলে রাষ্ট্রদ্রোহী ষড়যন্ত্র ও হিংসাত্মক কার্যকলাপের। সরকার নিয়োজিত বন্দীমুক্তি পর্যালোচনা কমিটি 'রাজনৈতিক বন্দী'-র স্বীকৃতি চাইলে আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার পরামর্শ দিলেও তাতে কোনও লাভ হয়নি বলে সিনহা জানালেন। নিম্ন আদালত বা জেলা আদালতে সরকার পক্ষ ইউএপিএ আইনে অভিযোগের মামলার উল্লেখ করে ছত্রধরদের পক্ষে তাঁর আবেদনের বিরোধিতা করেছে। আদালতও আবেদন নাকচ করেছে। কমিটির সদস্যদের যুক্তি ছিল— বামফ্রন্ট জমানায় জেল-আইনের বদলের জেরে রাজবন্দীর স্বীকৃতি এখন আদালতের হাতে। আবেদন করলে সরকার বিরোধিতা করবে না। আদালতের স্বীকৃতি পেলে বন্দীমুক্তির পথ প্রশস্ত হবে। কিছুই হয়নি। আইনমন্ত্রী মলয় ঘটকও সাফ জানিয়েছেন, ঢালাওভাবে আবেদনের বিরোধিতা না করার কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। 'কেস-টু-কেস' বিবেচনা করা হচ্ছে। বলাবাহুল্য, সেটা রাজনৈতিক বিবেচনা। সেই বিবেচনার ছাঁকনিতে ছত্রধর ও তাঁর সহবন্দীদের গলে যাওয়ার সম্ভাবনা অদূর ভবিষ্যতে নেই। স্বাভাবিক কারণেই অনেকের মতোই সিনহা তিতিবিরক্ত। তাঁর মন্তব্য: ''ওটা একটা ফেক রিভিউ কমিটি। কমিটির সাহস আছে কি ছত্রধরদের মুক্তির সুপারিশ করার!'' কমিটি সদস্যরা বলছেন, সরকার এখনও ছত্রধরসহ জঙ্গলমহলের মামলাগুলি সুপারিশের জন্য তাদের কাছে পাঠাননি। কেউ বলেছেন, সরকার পক্ষ গত মে মাসে ২৬২ জন রাজবন্দীর একটি প্রাথমিক তালিকা হাজির করে। তাতে নাকি ছত্রধরের নাম ছিল। কিন্তু সেই তালিকার কী হল তার সদুত্তর মেলেনি। সিনহার বক্তব্য সোজাসাপটা— ইউএপিএ মামলাই যদি জামিনের পথে অন্তরায় হয় তাহলে জাগরী বাস্কে, রাজারাম সোরেন বা সুচিত্রা মাহাতোদের মতো আত্মসমর্পণকারী মাওবাদী স্কোয়াড নেতা-নেত্রীদের মুক্তি সম্ভব হল কীভাবে? শিলদায় ইএফআর আক্রমণ ও অন্যান্য হত্যাকাণ্ডে অভিযুক্তদের মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রী পাশে দাঁড় করাতে পারলে ছত্রধর মাহাতোরা কী দোষ করলেন?

স্পষ্টতই অপরাধটা রাজনৈতিক। নিয়তির কাছে জানতে চাইলাম, ছত্রধরের দীর্ঘতর কারাবাসের বদলে পারিবারিক জীবনে শান্তির প্রয়োজনে তিনি ও পরিবারের বাকিরা কী চাইছেন? ছত্রধর তৃণমূলের সঙ্গে সমঝোতা করে নিন এমনটাই কি তাদের বাসনা? থমকে তাকালেন নিয়তি। তারপর দৃঢ়ভাবেই জবাব দিলেন— ''তাতে কি শান্তি ফিরবে জঙ্গলমহলে? তৃণমূল আজ সিপিএমের কায়দায় সব বিরোধী নিকেশ করতে চাইছে। হার্মাদদের জায়গা নিয়েছে ভৈরববাহিনী। আমার স্বামী চুপ করে গেলেও অন্য কোনও ছত্রধর প্রতিবাদে নামবেই। এভাবে শান্তি ফিরবে না কোনওদিনও।'' মৌন অনিল মাটি খুঁটছিলেন। স্তব্ধতা ভেঙে বললেন— ''আমি অত রাজনীতি বুঝি না। কিন্তু ওরা কি আমাদের নিজেদের মতো থাকতে দেবে?'' ছত্রধরের বাবা তৃণমূলের মন্ত্রী-সাংসদ তথা দাপুটে পিতা-পুত্র শিশির ও শুভেন্দু

অধিকারীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার ও তাঁদের সৌজন্যের প্রসঙ্গ তুললেন। সেই সঙ্গে ছত্রধরের মুক্তি-প্রসঙ্গে তাঁদের সাহায্য প্রার্থনার কথাও। স্বয়ং শুভেন্দু অবশ্য স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন— "বিষয়টি সর্বোচ্চ নেতৃত্বের ব্যাপার। আমি ওই পরিবারটির বিপদের দিনে পাশে দাঁড়িয়েছিলাম। কিন্তু জনগণের রায়ে যারা পরাজিত, তাদের কাছে সন্ত্রাসের অভিযোগ শুনতে রাজি নই। যে কোন মূল্যে মাওবাদী ও তাদের সমর্থকদের আমরা রুখবোই।"

নিয়তি অবশ্য মনে করিয়ে দিলেন, এই শুভেন্দুকেই সিপিএম নন্দীগ্রামে মাওবাদীদের গুলি সরবরাহ এবং তাদের সঙ্গে রাজনৈতিক আঁতাতের দায়ে কাঠগড়ায় তুলত। জনসাধারণের কমিটির জমানায় মাওবাদীদের হাতে সিপিএম ও অন্যান্য বিরোধীদের খুনের ঘটনা এবং নানবিধ অত্যাচারের প্রসঙ্গ তুললে তিনি কিছুটা সাফাই দেওয়ার ভঙ্গিতেই জবাব দিলেন : "মাওবাদীরা খুন করলে তার বিচার হবে। জনসাধারণের কমিটিতে শুধু মাওবাদীরা তো ছিল না। অনেক সময় ব্যক্তিগত আক্রোশ মেটাতে খুন-জখম হয়েছে। দোষ পড়েছে মাওবাদী বা কমিটির উপর।" মাওবাদীদের প্রতি বিশেষ করে ছোট দেওর শশধরের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা তিনি গোপন করেননি। তবে একই সঙ্গে ছত্রধরের পথ যে আলাদা সেটা জানাতেও ভোলেননি। "ভুল-ত্রুটি যাই হোক, দুভাই-ই যে যাঁর মতো করে গরীব মানুষের পক্ষে দাঁড়িয়েছে। তার জন্য কেউ প্রাণ দিল। কেউ এখনও জেলে পচছে। মানুষ একদিন ঠিক বিচার করবে।"

ছত্রধরের বাবা-মা মতাদর্শ বা রাজনীতির জটিলতা বোঝেন না। তবে ছেলেদের নিয়ে গর্ববোধ বৃদ্ধ দম্পতির কথায় বোঝা যায়। "শশধর যেদিন শেষবারের মত বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল, আমি ওকে আটকানোর চেষ্টা করলাম। বললাম, বুড়ো বাবা-মাকে ফেলে কোথায় যাচ্ছিস? সে বলল, তোমাদের মত লাখো বুড়ো বাবা-মার কথা কে ভাববে? সেই যে গেল, আর ফিরল না।" চোখ মুছতে মুছতে বললেন মা বেদনা। বেদনাই যার একমাত্র সম্বল আজ। বাবা আশুতোষ উদাস। ধরা গলায় বললেন : "শশধর ছোটবেলা থেকেই অন্যরকম। গড়বেতা মেদিনীপুরে পড়তে গিয়ে কীভাবে রাজনীতিতে জড়ালো জানি না। তবে ছত্রধর তুলনায় ছিল ফুলবাবু। ফুটবল নিয়ে মেতে থাকত। ঘরের কাজে মন ছিল না। দুভাইয়ের এমন পরিণতি হবে জানতাম না। দেশের মানুষ বুঝে দেখুক ওরা ভুল ছিল কী ঠিক!"

ধিক্কার!

গত ৩০ জুন ছত্তিশগড়ের প্রত্যন্ত গ্রাম বিজাপুরে মাওবাদী বলে অন্তত ২০ জুন নিরীহ গ্রামবাসীকে রাষ্ট্রীয় বাহিনী নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। এই জঘন্য ঘটনার বিরুদ্ধে 'অনীক' তীব্র ঘৃণা ও প্রতিবাদ জ্ঞাপন করছে— এবং সংশ্লিষ্ট সবার চরম শাস্তি দাবি করছে।

মানবাধিকার একটি বিলুপ্তপ্রায় 'প্রজাতি'!

১ পৃষ্ঠার পর

সম্ভবত সবচেয়ে জঘন্য কালা কানুন ইউপিএ। আক্রমণ ক্রমশ বাড়ছে মতপ্রকাশের অধিকারের উপর, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপর, শ্রমিক-কৃষক ও অন্যান্য মেহনতি মানুষের আন্দোলনের উপর। মার্কিনি বড়দা-র অনুসরণে 'সন্ত্রাস-প্রতিরোধ'-এর অজুহাতে যে কোনো প্রতিবাদকেই চিহ্নিত করা হচ্ছে 'সন্ত্রাসী' বা 'মাওবাদী' কার্যকলাপ হিসেবে, এবং তাদের সমস্ত আইনি অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। আদালতও অধিকাংশক্ষেত্রেই পুলিশ ও প্রশাসনের নির্দেশে কাজ করছে। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, রাজিন্দার সাচারের মতো প্রবীণ বিচারক পর্যন্ত বলতে বাধ্য হচ্ছেন যে, ১৯৭৫-৭৭-এর কুখ্যাত এমার্জেন্সি ছিল একটি রাজনৈতিক দলের চাপিয়ে দেওয়া স্বৈরতন্ত্র— বর্তমান 'অঘোষিত' এমার্জেন্সিতে সমস্ত শাসক দলই ক্ষমতায় বসে সেই স্বৈরতন্ত্রের পথ অনুসরণ করছে; ফলত গণতান্ত্রিক অধিকার এখন অনেক বেশি বিপন্ন। সেই এমার্জেন্সিতে আক্রমণ নেমেছিল মূলত মধ্যবিত্ত সমাজের মতপ্রকাশের অধিকারের উপর— যারা জনমত তৈরিতে বিশেষ ভূমিকা নেয়। আর এখন আক্রমণটা সবচেয়ে বেশি আসছে সমাজের প্রান্তবাসী আদিবাসী, দলিত ও মুসলিমদের উপর। আর মধ্যবিত্তদের যে মুষ্টিমেয় অংশ তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সামিল হচ্ছে, তাদেরও উচিত শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে। ফলত ছত্তিশগড়ের সোনু সোরি, মুম্বাইয়ের দলিত মানবাধিকার কর্মী সুধীর ধাওয়ালে, সালেমের পরিবেশ-কর্মী পীযূষ শেঠিয়া বা উড়িষ্যার গণনাথ পাত্রের মতো দলিত প্রতিবাদী মানুষদের পাশাপাশি আক্রমণ নেমে আসছে ডাঃ বিনায়ক সেন, সীমা আজাদ-বিশ্ব বিজয়দের উপরেও। স্তম্ভিত হতে হয় একথা জেনে যে, ভারতে এই মুহূর্তে ইউপিএ-সহ বিভিন্ন কালাকানুনে ঠিক ক'জন আটক আছে, বা সরকারি বাহিনীর হাতে ক'জনের মৃত্যু ঘটেছে, এমনকি সরকারের কাছেও তার নির্দিষ্ট তথ্য নেই। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের হিসেবে, গত বছর শুধু সরকারি হেফাজতেই মৃত্যু ঘটেছে অন্তত ৩০০ জনের।

এই প্রক্রিয়ার শেষ কোথায়— এই প্রশ্নের উত্তর কিন্তু নির্ভর করছে গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন মানুষদেরই প্রতিরোধের দুঃসাহসিকতা, অধ্যবসায় ও ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের উপর।

অনীক

বহরমপুরে পাঠকসভা

২৫ আগস্ট ❑ শনিবার ❑ বেলা ৩টে

স্থান : মুর্শিদাবাদ জেলা সাংবাদিক সংঘের হল

❖ জেলার সমস্ত পাঠকবন্ধুদের আমন্ত্রণ জানাই ❖